সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
ইসলামী
রেনেসাঁ
আন্দোলন

ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৬৫

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৯১

৮ম প্রকাশ

সফর	১৪২৪
বৈশাখ	১৪১০
এপ্রিল	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تجدید و احیاء دین -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI RENESA ANDOLON by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 40.00 Only.

ভূমিকা

ইসলামের সর্বাধিক ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোর মধ্যে 'মুজাদ্দিদ' শব্দটি অন্যতম। এ শব্দটির একটি মোটামুটি অর্থ প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনকে নতুন করে সঞ্জীবিত ও সতেজ করেন তিনি মুজাদ্দিদ। কিন্তু এর বিস্তারিত অর্থের দিকে অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দীনের 'তাজদীদ'—সংস্কারের তাৎপর্য কি, কোন্ ধরনের কাজকে 'পূর্ণ 'তাজদীদ' বলা যেতে পারে, এ কাজের ক'টি বিভাগ আছে, কোন্ ধরনের কাজকে 'তাজদীদ' বলা যেতে পারে এবং আংশিক তাজদীদও বা কাকে বলে, একথা অল্প লোকই জানেন। এ অজ্ঞতার কারণেই সাধারণ মানুষ ইসলামের ইতিহাসে মুজাদ্দিদ আখ্যাদানকারী মনীষীদের কর্মকাণ্ডের নিখুঁত পর্যালোচনা করতে অক্ষম। তারা শুধু এতটুকু জানে যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে তাইমিয়া, শায়খ আহমদ সরহিন্দী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এঁরা সবাই মুজাদ্দিদ। কিন্তু তারা জানে না, এঁদেরকে কোন্ পর্যায়ের মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে এবং কার সংস্কারমূলক কার্যাবলী কোন্ ধরনের এবং কতটুকু মর্যাদার অধিকারী ? এ অক্ষমতা ও গাফলতির অন্যতম কারণ হলো, যেসব নামের সাথে 'হযরত' 'ইমাম' 'হুজ্জাতুল ইসলাম' 'কুতুবুল-আরেফিন', 'যুবদাতুস সালেকীন' এবং এ ধরনের শব্দাবলী সংযোজিত হয়, মন-মস্তিষ্ক তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় এতটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, এরপর স্বাধীনভাবে তাদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে তাঁদের মধ্য থেকে কে এ আন্দোলনের জন্য কতটা এবং কোন্ পর্যায়ের কার্য সম্পাদন করেছেন এবং এ কার্যে তাঁর নিজের অংশ কতটুকু—এ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধারণত এ মনীষীগণের কর্মকাণ্ডকে অনুসন্ধানীর মাপাজোকা ভাষার পরিবর্তে ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করা হয়। ফলে পাঠক ভাবেন এবং সম্ভবতঃ লেখকের মনে একথাই থাকে যে, যাঁর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, 'তিনি কামেল পুরুষ' ছিলেন এবং তিনি যাকিছু করেছেন তা যে কোনো দিক দিয়েই 'কামালিয়াত'—পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছিল। অথচ বর্তমানে যদি আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য কোন প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাহলে এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অস্পষ্টতার দ্বারা কোন কাজ চলবে না। আমাদেরকে পূর্ণরূপে এ সংস্কারমূলক কাজকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের অতীত ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে হবে যে, বিগত শতাব্দীসমূহে আমাদের নেতৃবৃন্দ কতটা কাজ কিভাবে করেছেন, তাঁদের কার্যাবলী থেকে আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারি এবং তাঁদের কোন্

কোন্ কাজ অসম্পন্ন রয়ে গেছে, সেগুলোর দিকে আমাদেরকে এখন দৃষ্টি দেয়া উচিত।

এ বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। কিন্তু পুস্তকের লেখার অবসরই বা কোথায়? শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেবের প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে, এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই বিষয়টি সামান্য আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। হয়তো আমার এ সামান্য আলোচনা কোন সুযোগ্য ব্যক্তির জন্য ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস রচনা করার পথ প্রশস্ত করে দেবে।

এ প্রবন্ধটি বর্তমানে পুস্তকাকারে ছাপা হলেও আসলে এটি বেরিলির 'আলকোরান' পত্রিকার শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সংখ্যার জন্যে লেখা হয়েছিল। তাই এতে শাহ সাহেবের সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রতি তুলনামূলকভাবে অধিক বিস্তারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং অন্যান্য মুজাদ্দিদগণের কার্যাবলী প্রসংগক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাঠ করার সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত মুজাদ্দিদগণের যাবতীয় কার্যাবলী পুরোপুরি বর্ণনা করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং যেসব মুজাদ্দিদ ইসলামের ইতিহাসে বিশিষ্টতার অধিকারী হয়েছেন কেবল তাঁদের কথাই এখানে বর্ণিত। উপরন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাজদীদের কাজ অনেক করেছেন এবং প্রতি যুগে অনেক লোক করেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে অতি অল্প লোকই 'মুজাদ্দিদ' উপাধি লাভের অধিকারী হয়ে থাকেন।

–আবুল আ'লা

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ইং

সাম্প্রতিককালে ফেত্‌নাবাজ লোকেরা এ বইটিকে লক্ষ্য করে বিশেষভাবে তাঁদের নিশানাবাজী শুরু করেছেন। তাই আমি বইটি দ্বিতীয়বার পর্যালোচনা করে এর যেসব বাক্যাবলী থেকে নানান ফেত্‌না সৃষ্টি করা হচ্ছিল, সেগুলোকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। এই সংগে সেই সমস্ত বিবৃতি ও উদ্ধৃতাংশের বরাতও দিয়েছি, যেগুলো সম্পর্কে এই মনে করে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল যে, হয়তো এগুলো আমার নিজের মনগড়া। এছাড়া পুস্তকের শেষাংশে পরিশিষ্ট হিসাবে বিভিন্ন জবাবও সংযোজিত করেছি। এ জবাবগুলো 'তর্জুমানুল কুরআন'–এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নকারীকে আমি দিয়েছিলাম। যদিও এরপরও প্রশ্নকারীদের মুখ বন্ধ হবে না, তবুও শ্রোতার কর্ণ প্রতারিত হওয়া থেকে বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাবে।

আবুল আ'লা

অক্টোবর–১৯৬০ইং

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের আদর্শিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব

পৃথিবীতে মানুষের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থাই রচিত হবে তার অনিবার্য যাত্রারম্ভ হবে অতি-প্রাকৃতিক বা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াবলী থেকে। মানুষ সম্পর্কে এবং এ পৃথিবী—যার মধ্যে সে বাস করে—তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত জীবনের কোনো পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে না। দুনিয়ায় মানুষের আচরণ কেমন হবে এবং এখানে তাকে কিভাবে কাজ করতে হবে, এ প্রশ্ন আসলে এই পরবর্তী প্রশ্নগুলোর সংগে গভীর সম্পর্ক রাখে যে, মানুষ কি? এ দুনিয়ায় তার মর্যাদা কি? এ দুনিয়ার ব্যবস্থা কোন্ ধরনের, যার সংগে মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে? এ প্রশ্নগুলোর যে সমাধান নির্ণীত হবে, সে পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বিশেষ মত স্থিরীকৃত হবে। অতপর ঐ মতবাদের প্রকৃতি অনুযায়ী মানব জীবনে বিভিন্ন বিভাগ গড়ে উঠবে। আবার এই কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি চরিত্র ও কর্মকাণ্ড এবং সামষ্টিক সম্পর্ক ও ব্যবহার বিধানাবলী বিস্তারিত রূপ পরিগ্রহ করবে। এভাবে অবশেষে এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে তমুদ্দুনের বিরাট প্রাসাদ নির্মীত হবে। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত মানব জীবনের জন্যে যতগুলো ধর্ম এবং মত ও পথ তৈরী হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে অবশ্যি নিজের একটি স্বতন্ত্র মৌলিক দর্শন ও মৌলিক নৈতিক মতবাদ প্রণয়ন করতে হয়েছে। এই মৌলিক দর্শন ও নৈতিক দৃষ্টিভংগীই মূলনীতি থেকে নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়েও একটি পদ্ধতিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে। কেননা তাদেরই প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জীবন বিধানের প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। তারা জীবন বিধানের দেহে প্রাণের ন্যায়।

জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ

খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মানুষ ও বিশ্বজাহান সম্পর্কে চারটি অতিপ্রাকৃত (Metaphysical) মতবাদ স্থিরীকৃত হতে পারে। দুনিয়ার যতগুলো জীবন বিধানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকেই এই চারটির মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে অবশ্যি গ্রহণ করেছে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াত

প্রথম মতবাদটিকে আমরা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত আখ্যা দিতে পারি। এর মূল কথা হলো ঃ

বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাবলী একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পেছনে কোনো প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও মহান উদ্দেশ্য কার্যকরী নেই। এমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি তৈরী হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন হঠাৎ কোনো কার্যকারিতা ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে। এর কোনো খোদা নেই আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

মানুষ এক ধরনের পশু। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সম্ভবতঃ ঘটনাক্রমে এখানে তার উদ্ভব হয়েছে। তাকে কে সৃষ্টি করলো এবং কেন সৃষ্টি করলো, এ প্রশ্ন আমাদের নিকট অপ্রাসংগিক। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, এ পৃথিবীতে তার বাস, তার কিছু আশা-আকাংখা আছে—এগুলো পূর্ণ করার জন্যে তার প্রকৃতি ভেতর থেকে চাপ দেয়। তার কিছু শক্তি ও কয়েকটা যন্ত্র আছে—এগুলো তার আশা-আকাংখাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যম হিসেবে পরিণত হতে পারে। তার চারপাশে দুনিয়ার বিশাল বক্ষ জুড়ে অনেক বস্তু, অনেক সাজ-সরঞ্জাম, দেখা যাচ্ছে—এগুলোর ওপর ঐ শক্তি ও যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করে সে তার আশা-আকাংখা পূর্ণ করতে পারে। কাজেই নিজের জৈব প্রকৃতির দাবি পূরণ করা ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর এ দাবি পূরণ করার জন্যে উৎকৃষ্টতর উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা ছাড়া তার মানবিক শক্তি-সামর্থের দ্বিতীয় কোনো কার্যকারিতাও নেই।

মানুষের চাইতে বড় আর এমন কোনো জ্ঞানের উৎস এবং সৎ ও সত্যের উৎপত্তিস্থান নেই, যেখান থেকে সে তার জীবনের জন্যে বিধান লাভ করতে পারে। কাজেই নিজের চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, নিদর্শনাবলী এবং নিজের ইতিহাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তার নিজেকেই একটি জীবন বিধান রচনা করা উচিত।

বাহ্যতঃ এমন কোনো সরকার দৃষ্টিগোচর হয় না, যার সম্মুখে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই মানুষ স্বভাবতঃই একটি অদায়িত্বশীল প্রাণী। আর যদি কোনোক্রমে তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে তার নিজের সম্মুখে অথবা সেই কর্তৃত্বের সম্মুখে যা মানুষের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়ে মানুষের উপর বিরাজিত।

কার্যাবলীর ফলাফল এই পার্থিব জীবনের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই। কাজেই দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতেই ভুল ও নির্ভুল, ক্ষতিকর ও লাভজনক এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মীমাংসা করা হবে।

মানুষ যখন নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পর্যায়ে অবস্থান করে অর্থাৎ যখন নিজের অনুভূতি-গ্রাহ্যের বাইরে কোনো সত্য পর্যন্ত সে পৌঁছে না অথবা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের কারণে পৌঁছতে চায় না, তখন তার মনোজগত পূর্ণরূপে এ মতবাদের আওতাধীনে আসে। পার্থিব স্বার্থের মোহে অন্ধ মানুষেরা প্রতি যুগে এ মতবাদ গ্রহণ করছে। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সকল রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ, সভাসদ, শাসক সমাজ, বিত্তশালী ও বিত্তের পিছনে জীবন উৎসর্গকারীরা সাধারণভাবে এ মতবাদকে অগ্রাধিকার দান করেছে। আর ইতিহাসে যেসব জাতির উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির বন্দনা গীত গাওয়া হয়, তাদের প্রায় সবারই সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে এ মতবাদ কার্যকরী ছিল। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেও এই মতবাদ কার্যকরী আছে। যদিও পাশ্চাত্য দেশের সবাই খোদা ও আখেরাতকে অস্বীকার করে না এবং চিন্তার দিক দিয়ে সবাই বস্তুবাদী নৈতিকতার সমর্থক নয়, তবুও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সামগ্রিক ব্যবস্থায় যে শক্তি ক্রিয়াশীল তা ঐ খোদা ও আখেরাত অস্বীকার এবং ঐ বস্তুবাদী নৈতিকতার শক্তি। এ শক্তি তাদের জীবনে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে, যেসব লোক চিন্তাক্ষেত্রে খোদা ও আখেরাতকে স্বীকার করে এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী অনুসরণ করে, তারাও অবচেতনভাবে নিজেদের বাস্তব জীবনে নাস্তিক ও বস্তুবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা চিন্তার ক্ষেত্রে তারা যে মতবাদের অনুসারী তাদের বাস্তব জীবনের সংগে তার কোনো কার্যকরী সম্পর্ক নেই।

তাদের পূর্বের সমৃদ্ধশালী ও খোদা বিস্মৃত লোকদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বাগদাদ, দামেস্ক, দিল্লী ও গ্রানাডার সমৃদ্ধশালী লোকেরা মুসলমান হবার কারণে খোদা ও আখেরাত অস্বীকার করতো না। কিন্তু তাদের জীবনের সমস্ত কর্মসূচী এমনভাবে তৈরী হতো যেন খোদা ও আখেরাতের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারোর নিকট জবাব দেবার এবং কারোর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করারও কোন প্রশ্নই নেই। দুনিয়ায় একমাত্র তাদের কামনা-বাসনা, আশা-আকাংখারই অস্তিত্ব আছে। আর এই কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্যে যে কোনো উপায়-উপকরণ এবং যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে তারা স্বাধীন। দুনিয়ায় জীবন-যাপনের যে সময়টুকু পাওয়া গেছে, একমাত্র 'ভোগ ও বিলাসিতার' মাধ্যমেই তার সদ্ব্যবহার হতে পারে।

আগেই বলেছি, এ মতবাদের প্রকৃতিই হলো এই যে, এর ভিত্তিতে একটি নির্ভেজাল বস্তুবাদী নৈতিক ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। তা বইয়ের পাতায় লিখিত থাক বা কেবল মানস রাজ্যে চিত্রিত হয়ে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। তারপর ঐ মানসিকতা থেকে জ্ঞান, শিল্প, চিন্তা ও পরিকল্পনার ধারা উৎসারিত

হয় এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের সূক্ষ্মতর শক্তি অনুপ্রবেশ করে। অতপর এরই ভিত্তিতে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে ওঠে। এ নক্‌শা অনুযায়ী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। আইন ও সংবিধানের বিকাশ ও অগ্রগতি এরই ভিত্তিতে হয়। সবচাইতে বড় প্রতারক, বেঈমান, আত্মসাৎকারী, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, নিষ্ঠুর ও কলুষিত হৃদয় সম্পন্ন লোকেরাই এহেন সমাজের উপরিভাগে স্থান লাভ করে। সমগ্র সমাজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর তারা শিকল-ছাড়া বাঘের মতো সবরকমের ভীতি ও হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে মানুষের ওপর বেদম হামলা চালাতে থাকে। তাদের সমস্ত কূটনীতি মেকিয়াভেলির (Machiavelli) রাজনীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তাদের আইন পুস্তকে শক্তির নাম 'হক' এবং দুর্বলতার নাম 'বাতিল'। যেখানে কোনো বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেখানে কোনো জিনিসই তাদেরকে যুলুম থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ যুলুম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন ভয়বাহ রূপ পরিগ্রহ করে যে, শক্তিশালী শ্রেণী নিজের জাতির দুর্বল শ্রেণীর লোকদেরকে পিষে ফেলতে থাকে এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বে জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, দেশ জয় ও জাতি ধ্বংসের রূপে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত

দ্বিতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ শের্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সারকথা হলো ঃ বিশ্বজাহানের এ ব্যবস্থা কোনো ঘটনাক্রমিক প্রকাশ নয় এবং খোদাহীন অস্তিত্বের অধিকারীও নয়, কিন্তু এর একটি খোদা নয়, বহু খোদা আছে।

এ ধারণা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক নয় বরং নিছক কল্পনা নির্ভর। তাই কাল্পনিক, অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুর সংগে খোদার শক্তিকে সম্পর্কিত করার ব্যাপারে মুশরিকদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনোদিন হতে পারে না। অন্ধকারে দিশেহারা মানুষরা যার ওপর হাত রেখেছে, তাকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে। খোদার ফিরিস্তিতে হামেশা সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। ফেরেশতা, জ্বিন, আত্মা, নক্ষত্র, জীবিত ও মৃত মানুষ, বৃক্ষ, পাহাড়, পশু, নদী, পৃথিবী, আগুন ইত্যাদি সবকিছুকেই দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। প্রেম, কামনা, সৃষ্টি শক্তি, রোগ, যুদ্ধ, লক্ষ্মী, শক্তি ইত্যাদির ন্যায় অনেক বিমূর্ত ধারণাকেও খোদার আসনে বসানো হয়েছে। সিংহ-মানুষ, মৎস-মানুষ, পক্ষী-মানুষ, চার মস্তকধারী, সহস্রভূজ, হস্তিশূণ্ডধারী মানুষ প্রভৃতিও মুশরিকদের উপাস্যে পরিণত হয়ে এসেছে।

আবার এ দেব গ্রস্থীর চতর্দিকে কল্পনা ও পৌরাণিকতার (Mythology) একটা তেলেসমাতি জগত তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অশিক্ষিত ও অজ্ঞজাতি এখানে তাদের উর্বর মস্তিষ্ক ও শিল্পকারিতার এমন সব অদ্ভূত ও মজার মজার নমুনা পেশ করেছে যে, তা দেখে অবাক হতে হয়। যেসব জাতির মধ্যে প্রধান খোদা অর্থাৎ আল্লাহর ধারণা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে আল্লাহ তাঁর কর্তৃত্বকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন আল্লাহ একজন বাদশাহ এবং অন্যান্য খোদারা তাঁর উজির-নাজির, দরবারী, মোসাহেব ও কর্মচারী পর্যায়ের, কিন্তু মানুষ সেই বাদশাহ নামদার পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম, তাই অধীনস্থ খোদাদের মারফত যাবতীয় কার্যসম্পন্ন করা হয়, তাঁদের সংগেই সকল ব্যাপারে সরাসরি সম্পর্ক। অন্যদিকে যেসব জাতির মধ্যে প্রধান খোদার ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট বা একেবারে নেই বললে হয়, সেখানে খোদার যাবতীয় কর্তৃত্ব বিভিন্ন শক্তিশালী লোকদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পর এই দ্বিতীয় প্রকার জাহেলিয়াতটির স্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ এর স্রোতে ভেসে চলেছে। সবসময় নিম্নতম পর্যায়ের মানসিক অবস্থায় তারা এ পর্যায়ে নেমে আসে। খোদার নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে যেখানে মানুষ একমাত্র পরাক্রমশীল খোদার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেখানে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য ; কিন্তু নবী, ওলি, শহীদ, দরবেশ, গওস, কুতুব, ওলামা, পীর ও 'ঈশ্বরের বর-পুত্র'দের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব তবুও কোনো না কোনো পর্যায়ে ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে স্থানলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মুশরিকদের খোদাগণকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সেইসব নেক বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, যাদের সমগ্র জীবন মানুষের কর্তৃত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যয়িত হয়েছিল। একদিকে মুশরিকদের ন্যায় পূজা-অর্চনার পরিবর্তে ফাতেহাখানি, জিয়ারত, নজরনিয়াজ, উরূস, চাদর চড়ানো, তাজিয়া করা এবং এ ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় কাজ সম্বলিত একটি নতুন শরীয়ত তৈরী করা হয়েছে। আর অন্যদিকে কোনো তত্ত্বগত দলিল-প্রমাণ ছাড়া ঐসব নেক লোকদের জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব-তিরোভাব, কাশফ-কেরামত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর দরবারে তাঁদের নৈকট্যের ধরন সম্পর্কে পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরাণিকবাদের সংগে সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল একটি পৌরাণিকবাদ তৈরী করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ 'ওসিলা' 'রূহানী' মদদ' 'ফয়েজ' প্রভৃতি শব্দগুলোর সুদৃশ্য আবরণের আড়ালে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ককে ঐসব নেক লোকদের সংগে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেসব মুশরিকদের মতে বিশ্ব প্রভুর নিকট পৌছবার সাধ্য মানুষের নেই এবং মানুষের জীবনের

সংগে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নীচের স্তরের কর্মকর্তাদের সংগে জড়িত, কার্যতঃ সেসব আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারকারী মুশরিকের মতো অবস্থা সেখানেও সৃষ্টি হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা এ নীচের কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশ্যে উপাস্য, দেবতা, অবতার অথবা ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে আর এরা গওস, কুতুব, আবদাল, আওলিয়া, আহলুল্লাহ প্রভৃতি শব্দের আবরণে এদেরকে ঢেকে রাখে।

এ দ্বিতীয় ধরনের জাহেলিয়াতকে যুগে যুগে প্রথম ধরনের জাহেলিয়াত অর্থাৎ নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের সংগে প্রায়ই সহযোগিতা করতে দেখা গেছে। প্রাচীন যুগে ব্যাবিলন, মিশর, হিন্দুস্তান, ইরান, গ্রীক, রোম প্রভৃতি দেশের তাহজীব-তমুদ্দুন এ দুটি জাহেলিয়াতের সহ অবস্থান ছিল। বর্তমান যুগে জাপানী সভ্যতা সংস্কৃতিরও একই অবস্থা। এ সহযোগিতার বিভিন্ন কারণ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতে মানুষের সংগে তার উপাস্যগণের সম্পর্ক হলো এই যে, সে তাদেরকে নিছক কর্তৃত্বশালী এবং লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে এবং বিভিন্ন উপাসনা-আরাধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে এই উপাস্যগণের করুণা ও সাহায্য লাভ করার চেষ্টা করে। তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার নৈতিক নির্দেশনামা বা জীবন-যাপন সম্পর্কিত আইন কানুন লাভের সম্ভাবনাই নেই। কেননা বাস্তবে সেখানে কোনো খোদা থাকলে তবেই তো তিনি আইন ও নির্দেশ দিবেন। কাজেই এমন কোনো বস্তু যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে মুশরিকরা নিজেরাই অনিবার্যরূপে একটি নৈতিক মতবাদ তৈরী করে এবং এ মতবাদের ভিত্তিতে তারা নিজেরাই একটি শরীয়ত প্রণয়ন করে। এভাবে আসলে সেই নির্ভেজাল জাহেলিয়াতেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যেই নির্ভেজাল জাহেলিয়াত ও শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের তাহজীব-তমুদ্দুনের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য থাকে না যে, এক স্থানে জাহেলিয়াতের সংগে মন্দির পূজারী এবং নানান ধরনের পূজা ও বন্দনার রীতি প্রচলিত থাকে আর অন্য স্থানে তা থাকে না। নৈতিক চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে উভয় স্থানে কোনো পার্থক্য নেই। প্রাচীন গ্রীক ও পৌত্তলিক রোমের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের সংগে আজকের ইউরোপের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের যে মিল দেখা যায়, তার কারণও এই একটি।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির জন্যে শের্ক মিশ্রিত মতবাদ কোনো পৃথক মূলনীতি সরবরাহ করে না। এ অধ্যায়েও একজন মুশরিক নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পথেই পা বাড়ায়। এবং নির্ভেজাল

জাহেলিয়াতের সামাজিক আদর্শের পথেই মুশরিক সমাজের সমগ্র মানসিক ও চিন্তাগত বিকাশ ঘটে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, মুশরিকদের কল্পনাশক্তি সীমাতিরিক্ত, তাদের চিন্তায় কল্পনা প্রবণতার অস্বাভাবিক আধিক্য দেখা যায়। আর নাস্তিকরা হয় অনেকটা বাস্তবধর্মী, তাই কল্পনাভিত্তিক দর্শনের ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকার আগ্রহ নেই। তবে এ নাস্তিকরা খোদা ছাড়াই যখন এ বিশ্বজাহানের গ্রন্থী খুলবার চেষ্টা করে, তখন তাদের যুক্তি প্রমাণের বহর ঠিক মুশরিকদের পৌরাণিকতার (Mythology) মতোই হাস্যকর ও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। মোদ্দাকথা হলো, শের্ক ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই। আজকের ইউরোপ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে তার আধুনিক মতবাদের সূত্র প্রাচীন গ্রীক ও রোমের সংগে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে, যেন মনে হয় সে তাদের সন্তান।

তৃতীয়তঃ নির্ভেজাল জাহেলী সমাজ যে সমস্ত তমুদ্দুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, মুশরিক সমাজও সেগুলো গ্রহণ করার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে— যদিও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শের্ক ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা আছে। শের্কের রাজত্বে বাদশাহদেরকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের একটি শ্রেণী বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়। রাজবংশ ও ধর্মীয় নেতাদের দল সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এক বংশের ওপর অন্য বংশের এবং এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের একটি স্থায়ী মতবাদ উদ্ভাবন করা হয়। বিপরীত পক্ষে নির্ভেজাল জাহেলী সমাজে এই দোষগুলো বংশ পূজা, জাতি পূজা, জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কত্ব, পুঁজিবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাণশক্তি ও মৌলিক প্রেরণার দিক দিয়ে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া, মানুষের দ্বারা মানুষকে খণ্ড-বিখণ্ড করা এবং মানবতাকে বিভক্ত করে এক শ্রেণীর জনসমাজকে অন্য শ্রেণীর জনসমাজের রক্ত পিপাসুতে পরিণত করার ব্যাপারে উভয়ই একই পর্যায়ের।

বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত

তৃতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ বৈরাগ্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সংক্ষিপ্তসার হলো ঃ

এ পৃথিবী এবং এ পার্থিব অস্তিত্ব মানুষের জন্যে কারাগারের শাস্তি স্বরূপ। দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ মানুষের প্রাণ আসলে একটি শাস্তিভোগী কয়েদী। সমস্ত আমোদ-আহলাদ, কামনা-বাসনা, স্বাদ ও দৈহিক প্রয়োজন আসলে এ কারাগারের শিকল ও লোহার বেড়ী মাত্র। মানুষ এ জগত এবং এর বস্তুনিচয়ের

সংগে যতবেশী সম্পর্ক রাখবে, ততই আবর্জনায় তার সারা অংগ ভরে যাবে এবং ততবেশী শাস্তিলাভের অধিকারী হবে। নাজাত ও মোক্ষ লাভের একটি মাত্র পথ আছে। এজন্যে জীবনের যাবতীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস থেকে সম্পর্কচ্যুত হতে হবে। সমস্ত কামনা-বাসনাকে নির্মূল করতে হবে। সকল প্রকার ভোগ পরিহার করতে হবে। দৈহিক প্রয়োজন ও ইন্দ্রিয়ের দাবিসমূহ অস্বীকার করতে হবে। পার্থিব বস্তু সমষ্টি এবং রক্ত মাংসের সম্পর্কের সাথে যুক্ত যাবতীয় স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসাকে হৃদয় থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। সর্বোপরি নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকে ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে পীড়ন করতে হবে এবং এত অধিক পরিমাণে পীড়ন করতে হবে যেন আত্মার উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারে। এভাবে আত্মা সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং নাজাতের উন্নত স্থানসমূহে উড্ডীন হবার শক্তি অর্জন করবে।

এটি আসলে একটি অসামাজিক মতবাদ। কিন্তু সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর বিভিন্নভাবে এ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে। এর ভিত্তিতে একটা বিশেষ ধরনের জীবন দর্শন গড়ে ওঠে।—তার বিভিন্ন রূপ বেদান্তবাদ, মনুবাদ, প্লেটোবাদ, যোগবাদ, তাসাউফ, খ্রীস্টীয় বৈরাগ্যবাদ ও বুদ্ধমত প্রভৃতি নামে পরিচিত। এ দর্শনের সংগে এমন একটি নৈতিক ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে যা খুব কম ইতিবাচক এবং খুব বেশী বরং পুরোপুরি নেতিবাচক হয়। এ দুটি বস্তু সম্মিলিতভাবে সাহিত্য, আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও কর্ম জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। যেখানে তাদের প্রভাব পৌঁছায় সেখানে আফিম ও কোকেনের কাজ করে।

প্রথম দু ধরনের জাহেলিয়াতের সংগে এ তৃতীয় ধরনের জাহেলিয়াতটি সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সহযোগিতা করে ঃ

(১) এ বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত সৎ ও ধর্মভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত করে নির্জনবাসী করে তোলে এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের জন্যে পথ পরিষ্কার করে দেয়। অসৎ লোকেরা খোদার দুনিয়ায় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে অবাধে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় আর সৎ লোকেরা নিজেদের নাজাত ও মোক্ষ লাভের চিন্তায় তপস্যা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

(২) এ জাহেলিয়াতের প্রভাবে জনগণের মধ্যে অবাঞ্ছিত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভংগীর সৃষ্টি হয় এবং তারা তার সহজ শিকারে পরিণত হয়। এজন্যে রাজা-বাদশাহ আমীর-ওমরাহ ও ধর্মীয় কর্তৃত্বশালী শ্রেণী হামেশা এ বৈরাগ্যবাদী দর্শনে নৈতিক আদর্শের প্রচার ও বিস্তারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। আর তাদের ছত্রছায়ায় এ মতবাদ নিশ্চিন্তে বিস্তারলাভ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও পোপবাদের সংগে এ বৈরাগ্যবাদী দর্শনের কোনোকালে কোনো সংঘাত হয়েছে বলে ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না।

(৩) এ বৈরাগ্যবাদী দর্শন মানব প্রকৃতির নিকট পরাজিত হলে নানান রকমের বাহানা তালাশ করতে শুরু করে। কোথাও কাফ্ফারা দানের নীতি উদ্ভাবন করা হয়। এতে করে একদিকে মনের আশা মিটিয়ে গোনাহ করা যায় আবার অন্যদিকে জান্নাতও হাতছাড়া হয় না। কোথাও ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্যে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের বাহানা করা হয়। এর ফলে অন্তরের আগুনে ঘৃতাহুতিও দেয়া হয় আবার সংগে সংগে 'হুজুরে আলার' পাক-পবিত্রতার মধ্যেও কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। আবার কোথাও সংসার বৈরাগ্যের অন্তরালে রাজা-বাদশাহ ও ধনিকদের সাথে যোগসাজশ করে আধ্যাত্মিকতার জাল বিছানো হয়। এর জঘন্যতম রূপ প্রদর্শন করেছেন রোমের পোপ সম্প্রদায় ও প্রাচ্য জগতের রাজা-বাদশাহগণ।

এ জাহেলিয়াত নিজের স্বগোত্রীয়দের সংগে এহেন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নবীগণের উম্মতের মধ্যে এর অনুপ্রবেশ আরেক দৃশ্যের অবতারণা করে। খোদার দীনের ওপর এর প্রথম আঘাত হলো এই যে, সে এ দুনিয়াকে কর্মস্থল, পরীক্ষাস্থল ও পরকালের কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তে 'দারুল আজাব' ও 'মায়াজাল' হিসেবে মানুষের সম্মুখে পেশ করে। দৃষ্টিভংগির এ মৌলিক পরিবর্তনের কারণে মানুষ ভুলে যায় যে, তাকে এ পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে। সে মনে করতে থাকে, 'আমি এখানে কাজ করার ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়াবলী পরিচালনা করার জন্যে আসিনি বরং আমাকে আবর্জনা ও অপবিত্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ থেকে গা বাঁচিয়ে আমাকে দূরে সরে যেতে হবে। আমাকে এখানে নন-কোঅপারেটর হিসেবে থাকতে হবে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে।' এ ধারণার ফলে পৃথিবী ও তার সমুদয় কার্যাবলী সম্পর্কে মানুষ কেমন যেন সংশয়ী ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তো দূরের কথা, সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতেও ভয় করে। তার জন্যে শরীয়তের সমগ্র ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইবাদত-বন্দেগী ও খোদার আদেশ-নিষেধ যে পার্থিব জীবনের সংস্কার ও খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্যে মানুষকে তৈরী করে, এগুলোর এ অর্থ তাদের নিকট অগ্রাহ্য হয়। বিপরীত পক্ষে সে মনে করতে থাকে যে, ইবাদত-বন্দেগী এবং কতিপয় বিশেষ ধর্মীয় কাজ জীবনের গোনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ। কাজেই কেবল এগুলোকেই পূর্ণ মনোযোগের

সংগে যথাযথ পরিমাপ করে সম্পাদন করা উচিত, তাহলেই আখেরাতে নাজাত ও মোক্ষলাভ করা যাবে।

এ মানসিকতা নবীগণের উম্মতের একটি অংশকে মোরাকাবা, মোশাহাদা, কাশফ, রিয়াজাত, চিল্লাদান, অজীফা পাঠ, আমালিয়াত[১], মাকামাত[২] সফর ও হাকীকত প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যার[৩], গোলক ধাঁধায় নিক্ষেপ করেছে। তারা মুস্তাহাব ও নফল আদায়ের ব্যাপারে ফরজের চাইতেও বেশী মনোযোগী হয়েছে। এভাবে খোদার যে প্রতিনিধিত্বের কাজ জারি করার জন্যে নবীগণ তাশরিফ এনেছিলেন, তা থেকে তারা গাফেল হয়ে গেছে। অন্যদিকে আর একটি অংশের মধ্যে কাশফ ও কেরামত, দীনের নির্দেশের ব্যাপারে অযথা বাড়াবাড়ি, অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন, ছোট ছোট জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমাপ করা এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে অস্বাভাবিক মনোযোগ ও যত্ন নেয়ার রোগ জন্ম নিয়েছে। এমনকি খোদার দীন তাদের নিকট এমন একটি হালকা কাঁচপাত্রে পরিণত হয়েছে, যা সামান্য কথায় বা সামান্য ব্যাপারে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যায়, ফলে তাদের মনে সবসময় সন্ত্রস্তভাব বিরাজিত, যেন একটু এদিক-ওদিক না হয়ে যায়, তাদের শিরোপরি রক্ষিত কাঁচপাত্র যেন ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে যায়—এ সন্ত্রস্ততার মধ্যেই তাদের সবটা সময় অতিবাহিত হয়। দীনের মধ্যে এ গভীর সূক্ষ্মতার পথ প্রশস্ত হবার পর অনিবার্যরূপে স্থবিরতা, সংকীর্ণ চিন্তা ও স্বল্প হিম্মত সৃষ্টি হয়। তখন মানুষের মধ্যে উচ্চতর যোগ্যতার চিহ্নই বা কেমন করে অবশিষ্ট থাকতে পারে ! পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী দৃষ্টি দিয়ে মানব জীবনের বৃহত্তম সমস্যাবলীকে সে কিভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে ! কিভাবে ইসলামের বিশ্বজনীন মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে যুগের প্রতিটি আবর্তনে প্রতিটি নব পর্যায়ে সে মানবতাকে নেতৃত্বদান করতে পারে।

ইসলাম

চতুর্থ অতিপ্রাকৃত মতবাদটি পেশ করেছেন খোদার নবীগণ। এর সংক্ষিপ্তসার হলো ঃ

আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত এ সৃষ্টিজগত, আমরা নিজেরাও এর একটি অংশ বিশেষ—আসলে এক সম্রাটের সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এর মালিক। তিনিই এর একমাত্র শাসক ও পরিচালক। এ সাম্রাজ্যে

১. আমালিয়াত—তার চাইতে বড় বে-আমলের পদ্ধতি আজ পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি।
২. দুনিয়ার মাকামাত নয় রূহানী মাকামাত—আধ্যাত্মিক জগত।
৩. যেমন ধরুন, সর্বেশ্বরবাদ।

আর কারো হুকুম চলে না, সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত আর সমস্ত ক্ষমতা পূর্ণতঃ ঐ একজন মালিক ও শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত।

এ সাম্রাজ্যে মানুষ জন্মগত প্রজা। অর্থাৎ প্রজা হওয়া বা না হওয়া তার ইচ্ছা-নির্ভর নয়। বরং সে প্রজা হিসেবেই জন্মলাভ করেছে এবং প্রজা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্বহীনতার কোনো অবকাশই নেই। প্রকৃতগতভাবেও তা হতে পারে না। জন্মগত প্রজা এবং সাম্রাজ্যের একটি অংশ হওয়ার কারণে অন্যান্য অংশগুলো যেভাবে সম্রাটের নির্দেশের আনুগত্য করছে তেমনি তাকেও আনুগত্য করতে হবে, এছাড়া তার জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। সে নিজেই নিজের জন্যে জীবন বিধান তৈরী করার এবং নিজের কর্তব্য নিজেই স্থির করার অধিকার রাখে না। তার একমাত্র কাজ হলো মালিকুল মুলক—সম্রাটের পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করা। এ নির্দেশ আগমনের মাধ্যম হলো 'ওহি' আর যেসব মানুষের নিকট এ নির্দেশ আসে তাঁরা হলেন নবী।

কিন্তু সে মহান প্রভু মানুষের পরীক্ষার জন্যে সূক্ষ্মতর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি নিজে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের নির্দেশদান ও পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থাকেও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এ রাষ্ট্র এমনভাবে চলছে যে, বাহ্যতঃ এর কোনো শাসক দৃষ্টিগোচর হয় না, কোনো কর্মকর্তাও দেখা যায় না। মানুষ শুধু দেখছে, একটি কারখানা চালু আছে। তার মধ্যে সে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছে। সে কারোর অধীনস্ত এবং কারোর নিকট তাকে হিসেব দিতে হবে, তার বাহ্যেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোথাও এটা অনুভূত হয় না। চতুষ্পার্শ্বের বস্তুসমূহের মধ্যে এমন কোনো সুস্পষ্ট নিশানীও নেই, যার ভিত্তিতে বিশ্বজাহানের শাসনকর্তার কর্তৃত্ব এবং নিজের অধীনতা ও দায়িত্বশীলতার অবস্থা সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং তা প্রকাশিত হবার পর তাকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। নবীদের আগমন হয়, কিন্তু তাঁদের ওপর যে ওহি নাযিল হয় তা কেউ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে না অথবা কোনো সুস্পষ্ট আলামতও তাঁদের সংগে প্রেরিত হয় না, যা প্রত্যক্ষ করার পর তাঁদের নবুয়াত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আবার একটি সীমারেখার মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণ স্বাধীন দেখতে পায়। বিদ্রোহ করার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়, এর যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং দীর্ঘকালীন সুযোগ দেয়া হয়। এমনকি দুষ্কৃতি ও গোনাহের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছতে গিয়ে সে কোনো বাধা পায় না। মালিক ছাড়া অন্য কারোর বন্দেগী

করতে চাইলে তাতেও বাধা দেয়া হয় না। এজন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হয়—যাকে ইচ্ছা তার বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে পারে। বিদ্রোহ করলে এবং অন্যের দাসত্ব করলে উভয় অবস্থাতেই রেজেকের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না, বরং বরাবর রেজেক লাভ করতে থাকে। জীবন-যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম, কর্মের উপায়-উপকরণ এবং আয়েশ-আরামের দ্রব্য-সামগ্রী নিজের মর্যাদানুযায়ী বেশ ভালেভাবেই লাভ করতে থাকে এবং আমৃত্যু এ পাওনা পেয়ে যেতে থাকে। কখনো কোনো খোদাদ্রোহী বা অন্যের দাসত্বকারীকে তার এ অপরাধের দরুন পার্থিব সাজসরঞ্জাম এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করা বন্ধ হয়নি। বিশ্বজাহানের মানুষের ব্যাপারে এ বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই যে, স্রষ্টা মানুষকে বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তিধর্মিতা, আকাংখা ও স্বাধীন ইচ্ছার যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর মানুষকে যে এক ধরনের কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা করতে চান। এ পরীক্ষাকে পূর্ণাংগ রূপ দান করার জন্যে সত্যকে অদৃশ্য করে রেখেছেন—এভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে যাবে। মানুষকে নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা দান করেছেন—এভাবে মানুষ সত্যকে জানার পর কোনো চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে তার অনুগত হবে অথবা কামনার দাসত্ব গ্রহণ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এ বিষয়টির পরীক্ষা হয়ে যাবে। জীবন-যাপনের সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ এবং কর্মের সুযোগ দান না করা হলে তার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার পরীক্ষা হতে পারে না।

এ পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাকাল। তাই এখানে কোনো হিসাব নেই, কোনো শাস্তি ও পুরস্কার নেই। এখানে যা কিছু দান করা হয়, তা কোনো সৎকর্মের পুরস্কার নয় বরং পরীক্ষার সামগ্রী এবং যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আসে তাও কোনো অসৎ কর্মের শাস্তি নয় বরং যে প্রাকৃতিক বিধানের ওপর দুনিয়ার এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত প্রধানতঃ তারই আওতায় এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১] কর্মের আসল হিসাব, যাঁচাই-বাছাই এবং সে সম্পর্কে রায়দানের সময় আসবে এ পার্থিব জীবন শেষ হবার পর, তারই নাম আখেরাত। কাজেই দুনিয়ায় যাকিছু কর্মফল প্রকাশিত হয়, তা কোনো পদ্ধতির অথবা কোনো কর্মের ভুল বা নির্ভুল, ভালো বা মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য বা পরিত্যাজ্যের মানদণ্ডে পরিণত হতে পারে না। আসল মানদণ্ড হলো আখেরাতের

---

১. এর অর্থ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় আদতে কোনো প্রতিবিধান ব্যবস্থা কার্যকরী নেই। বরং যা আমি বলতে চাই, তাহলো এই যে, এখানকার প্রতিবিধান ও প্রতিফল দ্ব্যর্থহীন, চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট নয় এবং পরীক্ষার দিকটি সবরকমের পার্থিব শাস্তি ও পুরস্কারের ওপর কর্তৃত্বশালী। তাই এখানে যে কর্মফল প্রকাশিত হয় তাকে নৈতিক ভালো-মন্দের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যায় না।

ফলাফল। আখেরাতের কোন্ পদ্ধতি এবং কোন্ কর্মের ফল ভাল বা মন্দ হবে, তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণের ওপর অবতীর্ণ ওহির মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে আখেরাতের লাভ-ক্ষতি যার ওপর নির্ভর করে তাহলো এই যে, প্রথমত, মানুষ নিজের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও যুক্তিবাদীর নির্ভুল ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাই যে তার আসল শাসক তা জানতে পারে কিনা এবং তাঁর পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারে কিনা। দ্বিতীয়ত, এ সত্য অবগত হবার পর সে (নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও) সেচ্ছায় ও সাগ্রহে আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং তাঁর নির্দেশাবলীর সম্মুখে আনুগত্যের শির নত করে কিনা।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নবীগণ এ মতবাদ পেশ করে এসেছেন। এ মতবাদের ভিত্তিতে বিশ্বজাহানের যাবতীয় ঘটনাবলীর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা হয়। বিশ্বের দৃশ্যমান বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। কোনো পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ মতবাদ ভুল প্রমাণিত হয় না। এর ভিত্তিতে জাহেলিয়াতের জীবন দর্শন থেকে মূলগতভাবে পৃথক একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন গড়ে ওঠে। এ জীবন দর্শন বিশ্বজাহান ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিপুল তথ্যাবলী জাহেলিয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে সংকলন ও পরিবেশন করে। সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ তৈরী করে—জাহেলিয়াত সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্পের পথগুলো হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে—প্রাণশক্তি ও মৌলিকতার দিক দিয়ে জাহেলী উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগীর সংগে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। সে একটি পৃথক নৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে—জাহেলী নৈতিকতার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার ঐ তাত্ত্বিক ও নৈতিক বুনিয়াদের ওপর যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মীত হয়, তা হয় সমস্ত জাহেলী সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে একটি পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ জাহেলিয়াতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সারকথা হলো এই যে, এ সভ্যতার শিরা-উপশিরায় যে প্রাণশক্তি সক্রিয়, তা এক সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন খোদার কর্তৃত্ব, আখেরাত বিশ্বাস এবং মানুষের অধীনতা ও দায়িত্বশীলতার কথা ঘোষণা করে। বিপরীত পক্ষে প্রত্যেকটি জাহেলী সভ্যতার সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা, বল্গাহারা উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তি ও দায়িত্বহীনতার প্রেরণা অনুপ্রবেশ করে থাকে। তাই নবীগণের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবতার যে নমুনা তৈরী

হয় তার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ ও রং জাহেলী সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্ট নমুনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই পার্থক্য তার প্রতিটি অংশে ও প্রতিটি দিকেই স্বতঃস্ফূর্ত।

অতপর এর ভিত্তিতে তমুদ্দুন যে বিস্তারিত রূপলাভ করে তা সমগ্র দুনিয়ার অন্যান্য নকশা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। পবিত্রতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, জীবন-যাপন পদ্ধতি, সামাজিক রীতি-নীতি, ব্যক্তি চরিত্র, জীবিকা উপার্জন, অর্থ ব্যয়, দাম্পত্য জীবন, সাংসারিক জীবন, বৈঠকি নিয়ম-কানুন মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন আকৃতি, লেন-দেন, অর্থ বণ্টন, রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার গঠন, রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব, পরামর্শ পদ্ধতি, সিভিল সার্ভিস সংগঠন, আইনের মূলনীতি, মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত বিস্তারিত বিধানাবলী, আদালত, পুলিশ, হিসাব-নিকাশ, কর, ফিনান্স, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিভাগের নীতি, এমনকি সেনাবাহিনীর শিক্ষা ও সংগঠন এবং যুদ্ধ ও সন্ধির নীতিও এ তমুদ্দুনে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। প্রতিটি অংশে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা তাকে অন্যান্য তমুদ্দুন থেকে আলাদা করে রাখে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং একটি বিশেষ নৈতিক আচরণ সক্রিয় থাকে, যার সম্পর্ক থাকে এক খোদার সার্বভৌম কর্তৃত্ব, মানুষের অধীনতা ও দাসত্ব এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের গন্তব্যের সংগে।

মুজাদ্দিদের কাজ কি ?

মুসলিম জাতির মুজাদ্দিদগণের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করার পূর্বে তাঁরা যে তাজদীদ বা সংস্কারমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করেন সে সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা উচিত।

অভিনবত্ব ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণত অভিনব কাজ ও সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না এবং প্রত্যেক অভিনব কার্য সম্পাদনকারীকে সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয়া হয়। মানুষের ধারণা, যে ব্যক্তি কোনো একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জোরেশোরে তার প্রচলন শুরু করে, সেই মুজাদ্দিদ। বিশেষ করে যেসব লোক মুসলিম জাতির অবনতি প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে জাগতিক দিক দিয়ে রক্ষা করার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় এবং সমকালীন আধিপত্যশালী জাহেলিয়াতের সংগে আপোষ করে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের একটি অভিনব 'মিশ্রণ' তৈরী করে অথবা নিছক মুসলিম নামটি বাকী রেখে সমগ্র জাতিকে পূর্ণরূপে জাহেলিয়াতের রঙে রঞ্জিত করে দেয়—তাদেরকে মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তারা মুজাদ্দিদ নয়, তারা অভিনব কার্য সম্পাদনকারী 'মুতাজাদ্দিদ'। তারা কোনো সংস্কারমূলক কাজ করে না, নতুন কোনো কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হয় মাত্র। আর মুজাদ্দিদের কাজ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জাহেলিয়াতের সংগে আপোষ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার নাম সংস্কার নয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের অভিনব মিশ্রণ তৈরী করাও কোনো সংস্কারমূলক কাজ নয়। বরং ইসলামকে জাহেলিয়াতের দূষিত পানি থেকে ছেঁকে পৃথক করে নিয়ে কোনো না কোনো পর্যায়ে তাকে তার সত্যিকার নির্ভেজাল আকৃতিতে পুনর্বার অগ্রসর করার প্রচেষ্টা চালানোই মুজাদ্দিদের কাজ। এদিক দিয়ে মুজাদ্দিদ হন জাহেলিয়াতের ব্যাপারে কঠোর আপোষহীন মনোভাবের অধিকারী। জীবনে নগণ্যতম অংশেও তিনি জাহেলিয়াতের অস্তিত্বের সমর্থক নন।

মুজাদ্দিদের সংজ্ঞা

মুজাদ্দিদ নবী নন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি নবুয়াতের প্রকৃতির অনেক নিকটতর। মুজাদ্দিদ হন স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী। সত্য উপলব্ধি করার মতো গভীর দৃষ্টি তাঁর সহজাত। সব রকমের বক্রতা দোষমুক্ত সরল বুদ্ধিবৃত্তিতে তাঁর মনোজগত পরিপূর্ণ। প্রান্তিকতার বিপদমুক্ত হয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করার বিশেষ যোগ্যতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজের পরিবেশ এবং শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ও প্রতিষ্ঠিত বিদ্বেষমুক্ত হয়ে চিন্তা করার শক্তি, যুগের

বিকৃত গতিধারার সংগে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস, নেতৃত্বের জন্মগত যোগ্যতা এবং ইজতিহাদ ও পুনর্গঠনের অস্বাভাবিক ক্ষমতা মুজাদ্দিদের স্বকীয় বস্তু। এ ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে তিনি হন দ্বিধামুক্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। দৃষ্টিভংগী ও বুদ্ধি-জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি হন পূর্ণ মুসলমান। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা এবং অনুসন্ধান চালিয়ে দীর্ঘকালের জটিল আবর্ত থেকে সত্যকে উঠিয়ে নেয়া মুজাদ্দিদের কাজ। এসব বিশেষ গুণের অধিকারী না হয়ে কোন ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হতে পারে না। আর এইসব গুণাবলীই নবীর মধ্যে থাকে, তবে সেখানে থাকে এর চাইতে অনেক বেশী হারে।

মুজাদ্দিদ ও নবীর মধ্যে পার্থক্য

কিন্তু একটি মৌলিক বিষয় মুজাদ্দিদ ও নবীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। নবী ঐশী নির্দেশে তাঁর পথে নিযুক্ত হন। তিনি নিজের নিয়োগ সম্পর্কে অবগত থাকেন। তাঁর নিকট 'ওহি' নাযিল হয়। নবুয়াতের দাবীর মাধ্যমেই তিনি নিজের কাজের সূচনা করেন। তিনি মানুষকে নিজের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করা বা না করার ওপর মানুষের মুমিন ও কাফের হওয়া নির্ভরশীল। বিপরীত পক্ষে মুজাদ্দিদ এর মধ্যে কোনো একটিরও অধিকারী নন। মুজাদ্দিদ যদি নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে হন প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে—খোদার নির্দেশে নয়। অনেক সময় নিজের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কেও তিনি অবগত থাকেন না। বরং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে মানুষ তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁর ওপর ইল্হাম (খোদার পক্ষ থেকে মনের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব) হওয়া অপরিহার্য নয়। আর ইলহাম হলেও সে সম্পর্কে যে তিনি অবশ্যি সচেতন থাকবেন, এমন কোনো কথাও নেই। তিনি কোনো দাবীর মাধ্যমে নিজের কাজের সূচনা করেন না এবং এমন করার অধিকারও তাঁর নেই। কেননা তাঁর উপর ঈমান আনা বা না আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর যুগের সকল সৎ ও উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ধীরে ধীরে তাঁর চতুর্দিকে একত্রিত হয়। কেবল সেই সকল লোক তাঁর থেকে পৃথক থাকে, যাদের প্রকৃতি কোনো প্রকার বক্রতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু তবুও মুসলমান হওয়া তাঁকে স্বীকার করে নেয়ার শর্ত সাপেক্ষ নয়।[১] এ সমস্ত পার্থক্যসহ মুজাদ্দিদকে মোটামুটিভাবে নবীর পর্যায়ের কাজই করতে হয়।

---

১. অনেকে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন যে, মুজাদ্দিদগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের মুজাদ্দিদ হবার দাবী করেছেন। যেমন, মুজাদ্দিদ আলফিসানি (র) ও শাহ ওলিউল্লাহ (র)। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছেন যে, এই শ্রদ্ধেয় মুজাদ্দিদদ্বয় কেবল নিজেদের এ স্থানে অধিষ্ঠিত হবার কথাই প্রকাশ করেছেন। তাঁরা কোনো দাবী পেশ করেননি। তাঁদের কোনো কাজ থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং নিজেদেরকে মুজাদ্দিদ বলে মেনে নেবার দাবী জানিয়েছেন। অথবা তাঁরা একথাও বলেননি যে, যে তাদেরকে মুজাদ্দিদ বলে মেনে নেবে, কেবল সেই মুমিন হবে এবং নাজাত লাভ করবে।

মুজাদ্দিদের কাজ

মুজাদ্দিদের কাজের নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ উল্লেখযোগ্য ঃ

১. নিজের পরিবেশের নির্ভুল চিত্রাংকন। অর্থাৎ পরিস্থিতি পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করার পর জাহেলিয়াত কোথায় কতটুকুন অনুপ্রবেশ করেছে, কোন্ পথে তার আগমন হয়েছে, তার শিকড় কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত, ইসলামের অবস্থা বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে এসব সঠিকভাবে বুঝে নেয়া।

২. সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন। অর্থাৎ বর্তমানে কোথায় আঘাত করলে জাহেলিয়াতের বাঁধন টুটে যাবে এবং ইসলাম পুনর্বার সমাজ জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে, তা নির্ধারণ করা।

৩. নিজের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ। অর্থাৎ নিজে কতটুকুন শক্তির অধিকারী এবং কোন্ পথে সংস্কার করার শক্তি তাঁর আছে, এ সম্পর্কে নির্ভুল আন্দাজ করা।

৪. চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির প্রচেষ্টা। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করা, আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও নৈতিক দৃষ্টিভংগীকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা, শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যবস্থার সংস্কার করা, ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামী মানসিকতাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করা।

৫. সক্রিয় সংস্কার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ জাহেলী রসম-রেওয়াজসমূহ খতম করে দেয়া, নৈতিক চরিত্র ও বৃত্তিসমূহকে পরিচ্ছন্ন করা, মানুষের মধ্যে পুনর্বার শরীয়তের আনুগত্যের প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং পূর্ণ ইসলামী নেতৃত্ব দানের মতো লোক তৈরী করা।

৬. দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ দীনের মূলনীতিসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন তমুদ্দুনিক পরিস্থিতি ও তমুদ্দুনিক উন্নতির নির্ভুল দিক নির্ধারণ করা এবং শরীয়তের মূলনীতির আওতায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তমুদ্দুনের পুরাতন নক্শায় পরিবর্তনের এমন পদ্ধতি নির্ণয় করা, যার ফলে শরীয়তের প্রাণবন্ত অবিকৃত থাকে, তার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হয় এবং তমুদ্দুনের নির্ভুল উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হয়।

৭. প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ ইসলামকে দাবিয়ে দিতে বা নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত রাজনৈতিক শক্তির মোকাবিলা করা এবং তার শক্তি নির্মূল করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা।

৮. ইসলামী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে পুনর্বার সরকারকে সেই ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, যাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খিলাফত' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

৯. বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টি। অর্থাৎ একটি মাত্র দেশে অথবা যেসব দেশে মুসলমান পূর্ব থেকেই আছে কেবল সেখানেই ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত না হওয়া। বরং এমন একটি শক্তিশালী বিশ্বজনীন আন্দোলন সৃষ্টি করা, যার ফলে ইসলামের সংস্কারমূলক ও বিপ্লবী দাওয়াত সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করে, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, সমগ্র দুনিয়ার তমুদ্দুনিক ব্যবস্থায় এক ইসলামী বিপ্লব সূচিত হয় এবং মানব জাতির নৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইসলামের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

এই বিভাগগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্যে প্রথম বিভাগ তিনটি অপরিহার্য। কিন্তু অবশিষ্ট ছয়টি বিভাগের প্রত্যেকটি মুজাদ্দিদ হবার অপরিহার্য শর্তের মধ্যে গণ্য নয়। বরং এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি, দু'টি, তিনটি, চারটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করলে তাঁকে মুজাদ্দিদ গণ্য করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের মুজাদ্দিদ আংশিক মুজাদ্দিদ হবেন। পূর্ণ মুজাদ্দিদ কেবল তিনিই হবেন, যিনি উল্লিখিত বিভাগের প্রত্যেকটিতে পূর্ণ কার্য সম্পাদন করে নবুয়াতের উত্তরাধিকারিত্বের হক আদায় করবেন।

কামেল বা আদর্শ মুজাদ্দিদ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখনো কোনো কামেল মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটেনি। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারেননি। তাঁর পর যত মুজাদ্দিদ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে কোন একটি বিশেষ বিভাগে অথবা একাধিক বিভাগে কাজ করেছেন। কামেল মুজাদ্দিদের স্থান এখনো শূন্য আছে। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি, মানব-প্রকৃতি ও বিশ্ব পরিস্থিতি এমনি একজন 'নেতা'র জন্ম দাবী করে। তিনি এ যুগে অথবা যুগের হাজারো আবর্তনের পর জন্মলাভ করতে পারেন। তাঁরই নাম ইমামুল মেহদী। নবী করীম (স) হাদীসে তাঁরই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[২]

---

২. যদিও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজা, মুসতাদরাক প্রভৃতি কিতাবসমূহের বহুস্থানে উল্লেখিত হয়েছে, তবুও ইমাম শাতবী (র) 'মাওয়াফিকাত' কিতাবে এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) তাঁর 'মানসবে ইমামত' কিতাবে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন এখানে তার উল্লেখ লাভজনক হবে ঃ

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আমি বলতে পারি না সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে হাদীসটি এ সম্পর্কে বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীসের সংগে সামঞ্জস্যশীল। এ হাদীসটিতে ইতিহাসের পাঁচটি পর্যায়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি পর্যায় অতিক্রম হয়ে গেছে এবং চতুর্থ পর্যায়টি বর্তমানে চলছে। শেষের যে পঞ্চম পর্যায়টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সমস্ত আলামত একথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং তা ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আজকাল অনেকেই অজ্ঞতাবশত এ নামটি শুনেই নাসিকা কুঞ্চন করে থাকেন। তাদের অভিযোগ, ভবিষ্যতে আগমনকারী 'মর্দে কামেল'-এর প্রতীক্ষায় অজ্ঞ-অশিক্ষিত মুসলমানদের কর্মশক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তাই তাদের মতে যে সত্যের ভুল অর্থগ্রহণ করে অশিক্ষিত লোকেরা নিষ্কর্মা হয়ে যায় তার আদপে সত্য হওয়াই উচিত নয়। উপরন্তু তারা এও বলেন যে, প্রত্যেকটি ধর্ম

ان اول دينكم نبوه ورحمة ولكون فيكم ما شاء اللّه ان تكون ثم يرفعها اللّه جل جلاله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء اللّه ان تكون ثم يرفعها اللّه جل جلاله۔

ثم تكون ملكا عاضافيكون ما شاء اللّه ان يكون ثم يرفه اللّه جل جلاله۔

ثم تكون ملكا جريه فتكون ما شاء اللّه ان تكون ثم يرفعها اللّه جل جلاله۔

ثم تكون حلافة على منهاج النبوة تعمل فى الناس بسنة النبى ويلقى الاسلام بجر انه فى الارض يرصى عنها ساكين السماء وساكن الارض لازذع السماء من قطر الاصبة مدرار ولا ننع الارض من نباتها وبركاتها شليئا الا اخرجة۔

"তোমাদের দীনের আরম্ভ নবুয়াত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে—যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতপর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত পরিচালিত হবে—যতদিন আল্লাহ চান। অতপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে অতপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতপর আবার নবুয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে। এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের ওপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশী থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেটের সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্গীরণ করে দেবে।"

বিশ্বাসী জাতির মধ্যে কোনো না কোনো "অদৃশ্যালোক হতে আগমনকারী ব্যক্তি" সম্পর্কিত বিশ্বাসের অস্তিত্ব আছে। কাজেই এটি নিছক একটি ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু আমি বুঝি না শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর ন্যায় অন্যান্য নবীগণও যদি নিজেদের জাতিদেরকে এ সু-সংবাদ দিয়ে গিয়ে থাকেন যে, মানব জাতির পার্থিব জীবন শেষ হবার আগে ইসলাম একবার সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হবে এবং মানুষের রচিত সমস্ত 'ইজমের' ব্যর্থতার পর অবশেষে বিপর্যস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষ খোদার রচিত এ 'ইজমের' ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে এবং খোদার এ দান মানুষ এমন এক বিরাট ও মহান নেতার বদৌলতে লাভ করবে, যিনি নবীদের পদ্ধতিতে কাজ করে ইসলামকে তার নির্ভুল আকৃতিতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাহলে তাতে ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ কোথায় ? সম্ভবত নবীদের বাণী থেকে পৃথক হয়ে এ বিষয়টি দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অজ্ঞতার কারণে মানুষ তাকে তার আসল ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্ত ধারণার আবরণে জড়িয়ে ফেলেছে।

ইমাম মেহদী

মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমাম মেহদীর আগমনের ওপর বিশ্বাস রাখেন তারা যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তাদের বিভ্রান্তি এর প্রতি অবিশ্বাসী নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী মুতাজাদ্দিদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাঁরা মনে করেন, ইমাম মেহদী পুরাতন যুগের কোনো সূফী ধরনের লোক হবেন। তসবিহ হাতে নিয়ে অকস্মাৎ কোনো মাদ্রাসা বা খানকাহ থেকে বের হবেন। বাইরে এসেই 'আনাল মেহদী'–আমিই মেহদী বলে চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেবেন। ওলামা ও শায়খগণ কিতাব-পত্র বগলে দাবিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যাবেন এবং লিখিত চিহ্নসমূহের সঙ্গে তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি মিলিয়ে দেখে তাকে চিনে ফেলবেন। অতপর 'বাইয়াত' গ্রহণ শুরু হবে এবং জিহাদের এলান করা হবে। সাধনাসিদ্ধ দরবেশ এবং পুরাতন ধরনের গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। নেহাত শর্ত পূরণ করার জন্যে নামমাত্র তলোয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে, নয়তো আসলে বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। দোয়া-দরূদ-জেকের-তসবিহর জোরে যুদ্ধ জয় হবে। যে কাফেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সে-ই তড়পাতে তড়পাতে বেহুস হয়ে যাবে এবং নিছক বদদোয়ার প্রভাবে ট্যাংক ও জংগী বিমানসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মেহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকটা এ ধরনের বিশ্বাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যা অনুধাবন করেছি, তাতে দেখছি ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। আমার মতে আগমনকারী ব্যক্তি তার নিজের যুগের

একজন সম্পূর্ণ আধুনিক ধরনের নেতা হবেন। সমকালীন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি হবেন মুজতাহিদের ন্যায় গভীর জ্ঞান সম্পন্ন। জীবনের সকল প্রধান সমস্যাকে তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করবেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করবেন এবং সকল আধুনিকদের চাইতে বেশী আধুনিক প্রমাণিত হবেন। আমার আশংকা হয়, তাঁর 'নতুনত্বের' বিরুদ্ধে মৌলভী ও সুফী সাহেবরাই সবার আগে চিৎকার শুরু করবেন। উপরন্তু আমার মতে সাধারণ মানুষের থেকে তাঁর দৈহিক গঠন ভিন্ন রকমের হবে না এবং নিশানী দেখে তাঁকে চিহ্নিত করাও যাবে না। এবং তিনি নিজের মেহদী হবার কথাও ঘোষণা করবেন না। বরং হয়তো তিনি নিজেও জানবেন না যে, তিনিই মেহদী। তাঁর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তাঁর কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে মানুষ জানবে যে, তিনিই ছিলেন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠাকারী মেহদী। এতদিন তাঁরই আগমনের সুসংবাদ শুনানো হয়েছিল।[৩]

ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, দাবীর মাধ্যমে কার্যারম্ভ করার অধিকার নবী ছাড়া আর কারোর নেই এবং নবী ছাড়া আর কেউই নিশ্চিতভাবে জানেন না যে, তিনি কোনো খেদমতে নিযুক্ত হয়েছেন। 'মেহদীবাদ' দাবী করার জিনিস নয়, কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে যাবার জিনিস। এ ধরনের দাবী যারা করেন এবং যারা তাঁর ওপর ঈমান আনেন, আমার মতে, তাঁরা উভয়ই নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও নিম্নস্তরের মানসিকতার পরিচয় দেন।

মেহদীর কাজের ধরন সম্পর্কে আমি যতটুকু ধারণা রাখি, তাও এসব লোকের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর কাজের কোনো অংশে কেরামতি, অস্বাভাবিকতা, কাশ্‌ফ, ইলহাম, চিল্লা ও মুজাহাদা-মুরাকাবার কোনো স্থানই আমি দেখি না। আমি মনে করি, একজন বিপ্লবী নেতাকে যেভাবে এ দুনিয়ায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, অনুরূপভাবে মেহদীকেও সেইসব পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। তিনি নির্ভেজাল ইসলামের ভিত্তিতে একটি নতুন চিন্তাগত (School of Thought) গড়ে তুলবেন। মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার পরিবর্তন করবেন। একটি বিপুল শক্তিধর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।এ আন্দোলন একই সংগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়ই হবে। জাহেলিয়াত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে পিষে ফেলতে চাইবে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জাহেলিয়াতের কর্তৃত্বকে উলটিয়ে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে। এ রাষ্ট্রে একদিকে ইসলামের পূর্ণ

৩. এ স্থানে যেসব সন্দেহের অবতারণা করা হয়, বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রাণশক্তি কর্মতৎপর হবে আর অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতি চরম পর্যায়ে উপনীত হবে। এ প্রসংগে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "তাঁর শাসনে আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট হবে। আকাশ বিপুলভাবে তাঁর বরকতসমূহ নাযিল করবে এবং পৃথিবী তার পেটে রক্ষিত সমস্ত সম্পদ উদ্গীরণ করবে।"

ইসলাম একদিন সমগ্র দুনিয়ার চিন্তাধারা, তমুদ্দুন ও রাজনীতির ওপর বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, এ আশা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এমন একজন বিরাট নেতার জন্মলাভও নিশ্চিত, যার সর্বব্যাপী ও শক্তিশালী নেতৃত্বে এ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে। যারা এ ধরনের নেতার আবির্ভাবের কথা শুনে অবাক হন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দেখে আমি অবাক হই। খোদার এ দুনিয়ায় যদি লেনিন ও হিটলারের মতো মিথ্যাচারী নেতার আবির্ভাব হতে পারে, তাহলে একজন সত্য ও হেদায়েতের ইমামের আবির্ভাবকে সুদূর পরাহত মনে করা হচ্ছে কেন?

নবীদের মিশন

এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ধারাবাহিকভাবে নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

বৈরাগ্যবাদী সভ্যতাকে বাদ দিলে অন্য যে সমস্ত জাহেলিয়াত বা ইসলাম ভিত্তিক সভ্যতা জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ধারক ও দুনিয়ার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে একটি সর্বব্যাপী পদ্ধতির অধিকারী, তারা স্বভাবতঃ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা দখল, শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ এবং নিজের মনের মত করে জীবনের নক্‌শা তৈরী করতে চায়। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই কোনো বিধান ও মতবাদ পেশ করা অথবা তার ভক্ত হওয়া নিতান্তই অর্থহীন। সংসার বৈরাগী তো দুনিয়ার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেও নারাজ। বরং এক বিশেষ ধরনের 'সুলুক'— পদ্ধতির মাধ্যমে সে বাইরে থেকে নিজের কাল্পনিক নাজাতের মঞ্জিলে পৌঁছে যাবার চিন্তায় মগ্ন থাকে। তাই সে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের প্রয়োজন বোধ করে না এবং তা চায়ও না। কিন্তু যে সভ্যতা দুনিয়ার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে এক বিশেষ পদ্ধতির দাবীদার এবং এই পদ্ধতির অনুসরণের মধ্যে মানবতার কল্যাণ ও নাজাত মনে করে, তার কর্তৃত্বের চাবিকাঠি হস্তগত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা নিজের নক্‌শাকে কার্যকরী করার শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তার নক্‌শা বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং তা মানুষের মনে এবং কাগজের বুকেও বেশীক্ষণ অবস্থান করতে পারে না। যে সভ্যতার হাতে কর্তৃত্ব থাকে, দুনিয়ার সমস্ত কার্যাবলী তারই নক্‌শা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সে জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা, শিল্প ও সাহিত্যকে পথ প্রদর্শন করে। সে নৈতিক চরিত্রের কাঠামো তৈরী করে। সে সাধারণ শিক্ষা ও অনুশীলনীর

আয়োজন করে। তার বিধানের ভিত্তিতে তমুদ্দুনের সমগ্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে। তারই নীতি জীবনের সকল বিভাগে সক্রিয় থাকে। এজন্যে যে সভ্যতার নিজের কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই, জীবনের কোথাও তার জন্যে একটুও স্থান নেই। এমনকি দীর্ঘকাল বিজয়ী সভ্যতার প্রবল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে বিজিত সভ্যতাসমূহ কর্মজগত থেকে দূরে সরে পড়ে। তার ব্যাপারে দরদী দৃষ্টিভংগীর অধিকারী ব্যক্তিদের মনেও এ পদ্ধতি দুনিয়ায় চলতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। তার তথাকথিত ধারক ও বাহকগণ এবং তার নেতৃত্বের স্বকপোলকল্পিত উত্তরাধিকারীরাও বিরোধী সভ্যতার সঙ্গে আপোষ এবং কিছুটা দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে দফারফা করতে উদ্যত হয়। অথচ কর্তৃত্বের প্রশ্ন দুটি নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আপোষ ও সমঝোতা একেবারেই অসম্ভব। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি এ শরিকানা বরদাশতও করতে পারে না। শরিকানা ও বাটোয়ারা সম্ভব মনে করা স্বল্পবুদ্ধির প্রমাণ এবং একমাত্র ঈমান ও হিম্মতের অভাব হেতু এ ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করা যেতে পারে।

কাজেই 'হুকুমাতে ইলাহিয়া' কায়েম করে খোদার তরফ থেকে নবীগণ যে জীবনব্যবস্থা এনেছিলেন তাকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের মিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।[৪] তাঁরা জাহেলিয়াত পন্থীদেরকে এ অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, ইচ্ছা করলে তারা নিজেদের জাহেলী আকিদা-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। কিন্তু কর্তৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে তুলে দেবার এবং মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলীকে বলপ্রয়োগে জাহেলিয়াতের আইন-কানুন অনুযায়ী পরিচালিত করার অধিকার তাদেরকে দিতে কোনো দিন প্রস্তুত হয়নি এবং স্বভাবতঃ দিতেও পারতো না। এজন্য প্রত্যেক নবীই রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। অনেকের প্রচেষ্টা কেবল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা পর্যন্তই ছিল —যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। অনেকে কার্যতঃ বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেছিলেন ; কিন্তু হুকুমাতে ইলাহিয়া কায়েম করার আগেই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল ; যেমন ঈসা আলাইহি সালাম। আবার অনেকে এ আন্দোলনকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন—যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাম ও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৪. বর্তমান যুগে অনেক ধর্ম ভীরু লোক প্রায়ই বলে থাকেন যে, 'রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ জীবনের উদ্দেশ্য নয় বরং তা প্রদান করার জন্যে ওয়াদা করা হয়েছে।' একথা যারা বলেন, তাদের মন-মগজে রাষ্ট্র ক্ষমতা সম্পর্কে নিছক এই ধারণাই কার্যকরী আছে যে, এটি খোদা প্রদত্ত একটি পুরস্কার। এটি যে একটি কর্তব্য এবং খেদমত, সে ধারণা তাঁদের নেই। তাঁরা জানেন না যে, দীনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রয়োজন, তা অর্জন করা খোদার শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এ জন্যে জিহাদ করা ফরজ।

নবীর কাজ

নবীগণের কার্য পর্যালোচনা করলে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাই ঃ

১. সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করা। নির্ভেজাল ইসলামী দৃষ্টিভংগী, চিন্তা পদ্ধতি ও নৈতিক বৃত্তি তাদের মধ্যে এমন পরিমাণে সংযোজিত করতে হবে যাতে করে তাদের চিন্তা-পদ্ধতি, জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্য ও মর্যাদার মানদণ্ড এবং কাজের ধরন পূর্ণতঃ ইসলামের ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়।

২. এ শিক্ষায় প্রভাবিত লোকদের একটি শক্তিশালী দল গঠন করে জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো। এবং এ প্রচেষ্টায় সমকালীন তমুদ্দুনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করা।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করে তমুদ্দুনের সমস্ত বিভাগকে নির্ভেজাল ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা। এজন্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা, যার ফলে একদিকে ইসলামী বিপ্লবের সীমানা বিশ্বের বুকে ব্যাপকতর হতে থাকবে এবং অন্যদিকে প্রচার ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী জামায়াতে যেসব নতুন সদস্য ভর্তি হতে থাকবে, ইসলামী পদ্ধতিতে তারা মানসিক ও নৈতিক শিক্ষালাভ করতে থাকবে।

খেলাফতে রাশেদা

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেইশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কার্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেন। তাঁর পর আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও ওমর ফারূক (রা)-এর ন্যায় দুজন আদর্শ নেতার নেতৃত্বলাভের সৌভাগ্য ইসলামের হয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ন্যায় এ সর্বব্যাপী কাজের সিলসিলা জারি রাখেন। অতপর হযরত উসমান (রা)-এর হাতে কর্তৃত্ব আসে এবং প্রথম প্রথম কয়েক বছর রাসূলুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি পূর্ণরূপে জারি থাকে।

জাহেলিয়াতের আক্রমণ

কিন্তু একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্রুত বিস্তারের কারণে কাজ প্রতিদিন অধিকতর কঠিন হয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে হযরত উসমান (রা) যাঁর ওপর এ বিরাট কাজের বোঝা রক্ষিত হয়েছিল, তিনি তাঁর মহান পূর্বসূরীদেরকে

প্রদত্ত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না।[৫] তাই তাঁর খিলাফত আমলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে জাহেলিয়াত সমাজ ব্যবস্থা অনুপ্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। হযরত উসমান (রা) নিজের শিরদান করে এ বিপদের পথরোধ করার চেষ্টা করেন ; কিন্তু তা রুদ্ধ হয়নি। অতপর হযরত আলী (রা) অগ্রসর হন। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে জাহেলিয়াতের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করার জন্যে চরম প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তিনি জীবন দান করেও এই প্রতি বিপ্লবের পথ রোধ করতে পারেননি। অবশেষে নবুয়াতের পদ্ধতির পরিচালিত খিলাফতের জামানা শেষ হয়ে আসে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র তার স্থান দখল করে। এভাবে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ইসলামের পরিবর্তে আবার জাহেলিয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর জাহেলিয়াত ক্যানসার ব্যাধির ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজদেহে তার বাহুর বিস্তার করতে থাকে। কেননা কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এখন ইসলামের পরিবর্তে তার হাতে ছিল এবং রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার পর তার প্রভাবের অগ্রগতি রোধ করার ক্ষমতা ইসলামের ছিল না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে, জাহেলিয়াত উলঙ্গ ও আবরণ মত্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি বরং 'মুসলমান'-এর রূপ ধারণ করে এসেছিল। প্রকাশ্য নাস্তিক, মুশরিক বা কাফেরের মুখোমুখি হলে হয়তো মোকাবিলা করা সহজ হতো। কিন্তু সেখানে প্রথমেই ছিল তৌহিদের স্বীকৃতি, রিসালাতের স্বীকৃতি, নামায ও রোযা সম্পাদন এবং কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ আর তার পেছনে জাহেলিয়াত নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। একই বস্তুর মধ্যে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সমাবেশ এমন কঠিন জটিলতা সৃষ্টি করে যে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করা হামেশা প্রকাশ্য জাহেলিয়াতের সঙ্গে মোকাবিলা করার চাইতে বেশী কঠিন প্রমাণিত হয়েছে। উলঙ্গ জাহেলিয়াতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুজাহেদিন মাথায় কাফন বেঁধে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হবে এবং কোনো মুসলমান প্রকাশ্যে জাহেলিয়াতকে সমর্থন করতে পারবে না। কিন্তু এই মিশ্রিত জাহেলিয়াতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে শুধু মুনাফিকরাই নয়, অনেক খাঁটি মুসলমানও তার সমর্থনে কোমর বেঁধে অগ্রসর হবে এবং শুধু

৫. কতিপয় মুফতি সাহেবান এ বাক্যটিকে হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি অমর্যাদাকর বলে চিহ্নিত করেছেন। অথচ আমার বক্তব্য শুধু এতটুকুন যে, হযরত উসমান (রা)-এর মধ্যে শাসন পরিচালনার এমন কতিপয় গুণাবলীর অভাব ছিল, যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। এটি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় এবং ইতিহাসের ছাত্ররা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারেন। এটি ফিকাহ ও কালামের বিষয়বস্তু নয়। কাজেই ফতোয়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ফতোয়ার আকারে এ সম্পর্কে কোনো রায় প্রকাশ করা যেতে পারে না।

তাই নয়, বরং ঐ জাহেলিয়াতের সংগে যুদ্ধকারীকে উল্টো দোষারোপ করা হবে। জাহেলী নেতৃত্বের সিংহাসনে এবং জাহেলী রাজনীতির মসনদে 'মুসলমানের' সমাসীন হওয়া, জাহেলী শিক্ষায়তনে 'মুসলমানের' শিক্ষকতা করা এবং জাহেলিয়াতের আসনে 'মুসলমানের' মুর্শেদ হিসেবে উপবেশন করা এক বিরাট প্রতারণা বৈ কিছুই নয় এবং খুব কম লোক এই প্রতারণা থেকে বাঁচতে পারে।

এ প্রতি বিপ্লবের সবচাইতে ভয়াবহ দিক এই যে, ইসলামের আবরণে তিন ধরনের জাহেলিয়াতই তাদের শিকড় গাড়তে শুরু করে এবং তাদের প্রভাব প্রতিদিন অধিকতর বিস্তার লাভ করতে থাকে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াত রাষ্ট্র ও সম্পদ করায়ত্ত করে। নামে খিলাফত কিন্তু আসলে ছিল সেই রাজতন্ত্র যাকে খতম করার জন্যে ইসলামের আগমন হয়েছিল। বাদশাহকে 'ইলাহ' বলার হিম্মত কারোর ছিল না, তাই 'আস-সুলতানু যিল্লুল্লাহ'[৬]-এর তালাশ করা হয়। এ বাহানায় 'ইলাহ' যে আনুগত্য লাভের অধিকারী হন বাদশাহরাও তার অধিকার লাভ করে। এ রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় আমির-ওমরাহ, শাসকবর্গ, গভর্নরবৃন্দ, সেনাবাহিনী ও সমাজের কর্তৃত্বশালী লোকদের জীবনে কম-বেশী নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভংগী বিস্তার লাভ করে। এ দৃষ্টিভংগী তাদের নৈতিক বৃত্তি ও সামাজিকতাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। অতপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই এই সংগে জাহেলিয়াতের দর্শন, সাহিত্য এবং শিল্পও বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্রও এ পদ্ধতিতে সংকলিত ও রচিত হতে থাকে। কেননা এসব জিনিস অর্থ ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল। আর যেখানে অর্থ ও রাষ্ট্র জাহেলিয়াতের আয়ত্তাধীন সেখানে তাদের ওপরও জাহেলিয়াতের কর্তৃত্ব অনিবার্য। কাজেই এ কারণেই গ্রীক অনারব দর্শন, বিদ্যা ও সাহিত্য ইসলামের সংগে সংযুক্ত বলে কথিত সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার পথ খুঁজে পায়। এ

৬. হাদীসে এ শব্দটির উল্লেখ আছে, এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সম্পূর্ণ ভুল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় সুলতানের আসল অর্থ হলো কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বশালীর জন্যে এ শব্দটি নিছক কৃত্রিম অর্থে ব্যবহৃত হয়। নবী (স) এ শব্দটিকে কৃত্রিম অর্থে নয় বরং তার আসল অর্থে ব্যবহার করেছেন। নবী করীম (স)-এর ইরশাদের অর্থ হলো এই যে, রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব আসলে আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যে ব্যক্তির ওপর এ প্রতিচ্ছায়া পড়বে, সে যদি তার সম্মান বহাল রাখে অর্থাৎ হক ও ইনসাফ অনুযায়ী রাষ্ট্র চালায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা সম্মান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি খোদার এ ছায়াকে অপমান করবে অর্থাৎ যুলুম ও স্বার্থবাদিতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। নবী করীম (স)-এর এ জ্ঞানপূর্ণ বাণীকে বিকৃত করে লোকেরা বাদশাহকে খোদার প্রতিচ্ছায়া গণ্য করেছে এবং নবী করীম (স)-এর উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে এটিকে বাদশাহ পূজার বুনিয়াদে পরিণত করেছে।

সাহিত্যের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে 'কালাম' শাস্ত্রের বিতর্ক শুরু হয়, মোতাজিলা মতবাদের উদ্ভব হয়, নাস্তিকতা ও ধর্ম বিরোধিতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে এবং 'আকীদার' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ নতুন নতুন 'ফেরকা'—সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। এখানেই শেষ নয় বরং যে সমস্ত জাতিকে ইসলাম নৃত্য, গীত ও চিত্রাংকনের ন্যায় নির্ভেজাল জাহেলী শিল্প-সংস্কৃতির হাত থেকে উদ্ধার করেছিল তাদের মধ্যে এগুলো আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৭]

শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত জনগণের ওপর হামলা করে তাদেরকে তৌহিদের পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহির অসংখ্য পথে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। একমাত্র সুস্পষ্ট মূর্তিপূজা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি, নয়তো এমন কোনো ধরনের শের্ক ছিল না, যা 'মুসলমানদের' মধ্যে প্রচলিত হয়নি। পুরাতন জাহেলী মতবাদে বিশ্বাসী জাতিসমূহের যে সমস্ত লোক ইসলামের আওতায় প্রবেশ করে, তারা অনেক শের্কের ধারণা ও মতবাদ নিজেদের সংগে করে নিয়ে আসে। এখানে তাদেরকে শুধু এতটুকুন কষ্ট করতে হয় যে, পুরাতন মাবুদগণের স্থলে তাদেরকে মুসলিম মনীষীদের মধ্য থেকে কতিপয় নতুন মাবুদ তালাশ করতে হয়, পুরাতন মঠ-মন্দিরের স্থলে আউলিয়া-দরবেশগণের সমাধির ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং ইবাদতের পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানের স্থলে নতুন আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করতে হয়। এ কাজে দুনিয়াদার আলেম সমাজ তাদেরকে বিপুলভাবে সাহায্য করে এবং শের্ককে ইসলামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতো তা দূর করে দেয়। তারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সংগে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী বিকৃত করে ইসলামে আউলিয়া পূজা ও কবর পূজার জন্যে স্থান সংকুলান করে। শের্কের কাজ করার জন্যে ইসলামের পরিভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে এ নতুন শরীয়তের জন্যে আচার-অনুষ্ঠানের এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যে, তা সুস্পষ্ট ও বড় শের্কের আওতায় পড়ে না। এ সূক্ষ্ম শিল্পীসুলভ সাহায্য ছাড়া ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার পথ আবিষ্কার করা শের্কের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হতো না।

বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত ওলামা, মাশায়েখ, সুফী ও পরহেজগার লোকদের ওপর হামলা করে এবং তাদের মধ্যে সেসব ত্রুটি বিস্তার করতে থাকে, যেগুলোর দিকে আমি ইতিপূর্বে ইশারা করেছি। এ জাহেলিয়াতের প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্লেটোবাদী দর্শন, বৈরাগ্যবাদী চারিত্রিক আদর্শ এবং

৭. মাওলানা শিবলী নোমানী ও জাস্টিস আমির আলীর মতো লোকেরা ঐসব বাদশাহর এহেন কার্যাবলীকে ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুনের খেদমত বলে গণ্য করেছেন।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভংগী প্রসার লাভ করে। এ জীবন দর্শনটি শুধু সাহিত্য ও জ্ঞান সাধনাকেই প্রভাবিত করেনি বরং প্রকৃতপক্ষে সমাজের সৎ লোকদেরকে মরফিয়া ইনজেকশান দিয়ে স্থবিরত্বে পৌছিয়ে দিয়েছে, রাজতন্ত্রের জাহেলী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে, ইসলামী জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে জড়তা ও সংকীর্ণ চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং সমগ্র দীনদারীকে কতিপয় বিশেষ ধর্ম-কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে।

মুজাদ্দিদের প্রয়োজন

এ তিন ধরনের জাহেলিয়াতের ভীড় থেকে ইসলামকে উদ্ধার করে পুনরায় তাকে সবল ও সতেজ করার জন্যে মুজাদ্দিদগণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, জাহেলিয়াতের এ সয়লাবে ইসলাম একেবারেই ভেসে গিয়েছিল এবং জাহেলিয়াত পূর্ণতঃ বিজয় লাভ করেছিল। সত্যি বলতে কি, যেসব জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অথবা পরে প্রভাবিত হয়, তাদের জীবনে ইসলামের সংস্কারমূলক প্রভাব কম-বেশী চিরকাল বর্তমান থাকে। ইসলামের প্রভাবেই বড় বড় স্বৈরচারী ও দায়িত্বহীন বাদশাহরা কখনো কখনো ভয়ে কেঁপে উঠতো এবং সততা ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতো। ইসলামের গুণেই রাজতন্ত্রের অন্ধকারময় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা নেকী ও নৈতিক সততার প্রোজ্জ্বল শিখা প্রত্যক্ষ করি। যেসব শাহী খান্দান নিজেদেরকে খোদার ন্যায় পরাক্রমশালী মনে করতো তাদের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই কারণে অনেক দীনদার, খোদাভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। তাঁরা রাজশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যথাসম্ভব দায়িত্বের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এমনিভাবে শাহী দরবারে, দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষায়তনে, ব্যবসায়ে ও শিল্পের কর্মস্থলে, চিত্তশুদ্ধি ও সংসার বিরাগীর খানকায় এবং জীবনের অন্যান্য বিভাগেও ইসলাম অনবরত কমবেশী নিজের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। জনগণের মধ্যে শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও ইসলাম হামেশা আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চরিত্র ও সামাজিকতার মধ্যে সংস্কারমূলক ও প্রতিরোধমূলক উভয় দিক দিয়ে নিজের অনুপ্রবেশ জারি রাখে, যার ফলে মুসলিম জাতির চারিত্রিক মান মোটামুটি অমুসলিম জাতিসমূহের থেকে হামেশা উন্নত থাকে। এছাড়াও প্রতি যুগে এমন লোকও সবসময় ছিল, যারা দৃঢ়তার সাথে ইসলামী নীতি অনুসরণ করে এবং ইসলামী জ্ঞান ও কর্মকে নিজের জীবনে এবং নিজের সীমিত পরিবেশে জীবিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু নবী প্রেরণের যে আসল উদ্দেশ্য ছিল—তার জন্যে এ দুটো জিনিস অকিঞ্চিত ছিল। জাহেলিয়াতের হাতেই কর্তৃত্ব থাকবে এবং ইসলাম নিছক একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি হিসেবে কাজ

করবে, এ যেমন যথেষ্ট ছিল না তেমনি এও যথেষ্ট ছিল না যে, এখানে ওখানে দু' চারটি লোকের সীমিত জীবন ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর বৃহত্তর সমাজ জীবনে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মিশ্রিত উপাদান প্রসার লাভ করতে থাকবে। কাজেই প্রতি যুগে দীন এমন শক্তিশালী ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী ছিল এবং আজো আছে, যারা বিপথে পরিচালিত জীবনধারা পরিবর্তন করে তাকে পুনর্বার ইসলামের পথে অগ্রসর করতে সক্ষম।

'মাই ইউজাদ্দিদুলাহা দীনাহা' হাদীসটির ব্যাখ্যা

নবী করীম (স) তাঁর একটি হাদীসে এরই খবর দিয়েছেন। হাদীসটি আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো ঃ

ان اللـه يـبـعـث لـهذه الامـة علـى راس كل ماة سنة من يجد دلـها دينها -

> 'প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে আল্লাহ্ তাআলা এ উম্মতের জন্যে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যিনি তার জন্যে তার দীনকে সবল ও সতেজ করবেন।'

কিন্তু এ হাদীস থেকে অনেক লোক 'তাজদীদ' ও 'মুজাদ্দেদীন' সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা 'আলা রাসি কুল্লি মেয়াতিন'–প্রতি শতকের শিরোভাগে—থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, প্রতি শতকের শুরুতে বা শেষভাগে আর 'মাই ইউজ্জাদ্দিদুলাহা দীনাহা'—যিনি তাঁর জন্যে তার দীনকে সবল ও সতেজ করবেন—থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ কাজ নিশ্চয়ই এক ব্যক্তিই করবে। তাই তারা ইসলামের অতীত ইতিহাসে প্রতি শতকের শুরুতে বা শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দীনের সংস্কারের কাজও করেছেন, এমন লোকদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অথচ 'রাস' এর অর্থ শুরু বা শেষ ভাগ নয়। প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে কোনো ব্যক্তি বা দলকে প্রেরণ করার পরিষ্কার অর্থ হলো এই যে, তারা সমকালীন জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের গতিধারার ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করবেন। আর 'মান' শব্দটি আরবী ভাষায় একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। তাই 'মান' অর্থ এক ব্যক্তিও হতে পারে এবং বহু ব্যক্তিও হতে পারে ; আবার সমগ্র প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। নবী করীম (স) যে খবর দিয়েছেন তার সুস্পষ্ট অর্থ হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ্ ইসলামী ইতিহাসের কোনো এক শতাব্দীও এমন লোকদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না, যারা জাহেলিয়াতের তুফানের মোকাবিলা করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তি ও আকৃতিতে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাবেন। এক শতাব্দীতে যে শুধু একজন মুজাদ্দিদ হবেন এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এক শতাব্দীতে একাধিক ব্যক্তি ও দল এ

কার্য সম্পাদন করতে পারেন। সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্যে যে শুধু একজন মুজাদ্দিদ হবেন এরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একই সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি দীনের তাজদীদের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। এ প্রসংগে যে ব্যক্তি কোনো কার্য সম্পাদন করবেন, তাকেই যে, 'মুজাদ্দিদ' উপাধি দান করা হবে, এমনও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ উপাধি একমাত্র তাদেরকেই দান করা যেতে পারে, যাঁরা দীনের তাজদীদের জন্যে কোনো বিরাট ও বিশিষ্ট কার্য সম্পাদন করেন।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে আমি ভবিষ্যতের প্রধান মুজাদ্দিদের উল্লেখ পূর্বাহ্নেই করলাম। এর কারণ হলো এই যে, মানুষ কামেল মুজাদ্দিদের মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে আগেই ওয়কিফহাল হয়ে যাবে। এতে করে তাদের জন্যে প্রত্যাশিত পূর্ণতার মোকাবিলায় আংশিক সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মর্যাদা ও স্থান উপলব্ধি করা সহজ হবে। এ পর্যন্ত যতগুলো সংস্কারমূলক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এবার আমি তুলে ধরবো।

উমর ইবনে আবদুল আযীয

ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ হলেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)।[৮] রাজ পরিবারে তাঁর জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেখেন, পিতা মিসরের ন্যায় বিরাট দেশের গভর্নর। আরো বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজেও উমাইয়া সরকারের অধীনে গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। বনু উমাইয়া বংশীয় বাদশাহ্গণ যে সমস্ত জায়গীরের সাহায্যে নিজেদের খান্দানকে বিপুল ধনশালী করেন, তাতে তাঁর এবং তাঁর পরিবার পরিজনেরও বিরাট অংশ ছিল। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক ৫০ হাজার আশরফি। বিত্তশালীর ন্যায় শান-শওকতের সংগে জীবন-যাপন করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, খানা-পিনা, বাড়ি-ঘর, যানবাহন, স্বভাব-চরিত্র সবই ছিল শাহজাদার ন্যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে তিনি যে কার্য সম্পাদন করেন, তার সংগে তাঁর পরিবেশের কোনো দূরতম সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু তাঁর মাতা ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর পৌত্রী। নবী করীম (স)-এর ওফাতের ৫০ বছর পর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর যুগে অগণিত সাহাবা ও তাবেঈন জীবিত ছিলেন। শুরুতে তিনি হাদীস ও ফিকাহ্র পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রথম শ্রেণীর মুজাদ্দিদদের মধ্যে গণ্য হতেন এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন। কাজেই নবী করীম (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তমুদ্দুনের বুনিয়াদ কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং খেলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হবার পর এ বুনিয়াদসমূহে কোন্ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তত্ত্বগত দিক দিয়ে একথা জানা ও উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। অবশ্য কার্যতঃ যে জিনিসটি তাঁর পথের প্রতিবন্ধক হতে পারতো, তাহলো এই যে, তাঁর নিজেরই খান্দান ছিল এ

৮. তিনি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

জাহেলী বিপ্লবের স্রষ্টা। এ বিপ্লব থেকে পূর্ণতঃ ও বিপুলভাবে লাভবান হচ্ছিল তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি। তাঁর বংশগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত লালসা এবং ভবিষ্যত বংশধরদের পার্থিব মঙ্গলের জন্যে তাকেও নিজের রাজতখ্‌তে ফেরাউনের ন্যায় জেঁকে বসা উচিত ছিল। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেককে নিরেট বস্তুগত লাভের মোকাবিলায় কুরবান করে দিয়ে হক, ইনসাফ, নৈতিকতা ও নীতিবাদিতার গোলক ধাঁধায় পদার্পণ না করাই তার জন্যে বেহতের ছিল। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সে নেহাত ঘটনাক্রমে যখন তিনি রাজতখ্‌তের অধিকারী হন এবং অনুভব করতে পারেন যে, কি বিপুল বিরাট দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন আচানক তাঁর জীবনের ধারা পাল্টে যায়। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই তিনি জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় নিজের জন্যে ইসলামের পথ বেছে নেন। যেন এটি তাঁর পূর্বস্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত ছিল।

বংশানুক্রমিক পদ্ধতিতে তিনি রাজতখ্‌তের মালিক হন। কিন্তু বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করার সময় জনসমাবেশে তিনি পরিষ্কার বলে দেন ঃ "আমি তোমাদেরকে নিজের বাইয়াত থেকে আজাদ করে দিচ্ছি, তোমরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাউকে খলিফা নির্বাচন করতে পারো।" অতপর জনসাধারণ যখন সর্বসম্মতভাবে এবং সাগ্রহে বললো যে, আমরা আপনাকেই নির্বাচন করছি, তখনই তিনি স্বহস্তে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অতপর রাজকীয় জাঁক-জমক, ফেরাউনের শাসন পদ্ধতি, কাইসার ও কিসরার দরবারী নিয়ম-নীতি সবই বিদায় করে দেন এবং প্রথম দিনেই রাজযোগ্য সবকিছুই পরিত্যাগ করে মুসলমানদের মধ্যে তাদের খলিফার যোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

অতপর রাজবংশের লোকেরা যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, সেদিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাদেরকে সবদিক দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনেন। তাঁর নিজের জায়গীর সহ অন্যান্য যেসব জায়গীর রাজবংশের দখলে ছিল সবগুলিই বায়তুলমালে ফিরিয়ে দেন। এ পরিবর্তনের ফলে তাঁর নিজের যে ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজারের পরিবর্তে মাত্র দুশো আশরফিতে নেমে আসে। বায়তুলমালের অর্থকে তিনি নিজের এবং নিজের খান্দানের জন্যে হারাম করে দেন। এমনকি খলিফা হিসেবে বেতনও গ্রহণ করেননি। নিজের জীবনের সমগ্র রূপটিই বদলিয়ে দেন। খলিফা হবার আগে রাজোচিত শান-শওকতের সংগে

জীবন-যাপন আর খলিফা হবার সংগে সংগেই ফকিরি জীবন অবলম্বন,[৯] অবশ্যই বিস্ময়ের ব্যাপার।

স্বগৃহ ও পরিজনদের সংশোধনের পর তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে নজর দেন। অত্যাচারী গভর্নরদেরকে বরখাস্ত করেন এবং গভর্নরদের দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্যে সৎলোকদের অনুসন্ধান করে বের করেন। সরকারের প্রশাসনিক কর্মচারিবৃন্দের নিয়ম-কানুন মুক্ত হয়ে প্রজাদের জান, মাল, ইজ্জত-আবরুর ওপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হয়ে বসেছিল। তিনি তাদেরকে পুনর্বার আইন-শৃংখলার অনুগত করেন এবং আইনের রাজত্ব কায়েম করেন। কর নির্ধারণের সমগ্র নীতি-নিয়মই পরিবর্তিত করেন। এবং আবগারীসহ বনি উমাইয়া বাদশাহগণ যে সমস্ত অবৈধ ও অন্যান্য কর বসিয়েছিলেন, সেগুলোকে সংগে সংগেই বাতিল করে দেন। যাকাত আদায়ের জন্যে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা নতুনভাবে সংশোধন করেন এবং বায়তুলমালের অর্থকে পুনর্বার সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দেন। অমুসলিম প্রজাদের সাথে যেসব অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল, সংগে সংগেই তার প্রতিকার করেন। তাঁদের যেসব উপাসনালয় অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। তাদের যেসব জমি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের প্রাপ্য যাবতীয় অধিকার পুনর্বার তাদেরকে প্রদান করেন। বিচার বিভাগকে সরকারের শাসন বিভাগের অধীনতা মুক্ত করেন। এবং মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম ও স্পিরিট উভয়কেই সরকারী ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত করে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের হাতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

অতপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাহায্যে তিনি অর্ধ শতাব্দীকালের জাহেলী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণে সমাজ জীবনের চতুর্দিকে বিস্তার লাভকারী জাহেলিয়াতের নিদর্শনসমূহকে জনগণের মানসিক, নৈতিক ও সমাজ জীবন থেকে নির্মূল করতে উদ্যোগী হন। বিকৃত আকিদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করে দেন। ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর শিক্ষার দিকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দৃষ্টি পুনর্বার আকৃষ্ট করেন এবং এমন একটি তত্ত্বগত আন্দোলন গড়ে তুলেন যার প্রভাবে ইসলামে আবু হানিফা (র), মালিক (র), শাফেয়ী (র) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ন্যায় মজুতাহিদগণের আবির্ভাব

৯. জীবনীকাররা বলেন যে, খলিফা হবার আগে হাজার দিরহাম মূল্যের পোশাক উমর ইবনে আবদুল আযীযের পছন্দ হতো না ; কিন্তু খলিফা হবার পর চার-পাঁচ দিরহাম মূল্যের পোশাকও নিজের জন্যে বড়ই মূল্যবান মনে করতেন।

হয়। শরীয়তের আনুগত্য করার প্রেরণা মানুষের মধ্যে নতুন করে সঞ্জীবিত করেন। রাজতন্ত্রের বদৌলতে সৃষ্ট শরাব পান, চিত্রাংকন ও বিলাসিতার ব্যাধি নির্মূল করেন। এবং যেসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মোটামুটি তিনি সেগুলো পূর্ণ করেন অর্থাৎ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনজীবন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর এ সরকার পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করে। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, ওলিদের আমলে লোকেরা তাদের আলাপ-আলোচনায় বৈঠকে অট্টালিকা ও উদ্যান সম্পর্কে আলোচনা করতো। সোলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের জামানায় ইন্দ্রিয় লিপ্সার দিকে জনগণ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলিফা হবার পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কোথাও চারজন লোক একত্রিত হলেই সেখানে নামায, রোযা ও কুরআন সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়ে যেতো। অমুসলিম প্রজাদের ওপর এ সরকারের এতবেশী প্রভাব পড়ে যে, এ অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে এবং জিজিয়ার আয় আচানক এতটা হ্রাস প্রাপ্ত হয় যে, তার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ইসলামী রাষ্ট্রের চারপাশে যেসব অমুসলিম রাষ্ট্র ছিল হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদের মধ্য থেকে একাধিক রাষ্ট্র ইসলাম গ্রহণ করে। তৎকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রোম সাম্রাজ্য। প্রায় এক শতাব্দীকাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়েও তাদের সংগে রাজনৈকি সংঘর্ষ জারি ছিল। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের ওপর তাঁর বিরাট নৈতিক প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে রোম সম্রাট যে মন্তব্য করেন, তা থেকেই তা আন্দাজ করা যায় ঃ

> "কোনো সংসার বৈরাগী যদি সংসার ত্যাগ করে নিজের দরজা বন্ধ করে নেয় এবং ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তাহলে আমি তাতে মোটেই অবাক হই না। কিন্তু আমি অবাক হই সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যার পদতলে ছিল দুনিয়ার বিপুল সম্পদ-সম্পত্তি আর সে তা হেলায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ফকিরের ন্যায় জীবন-যাপন করে।"

ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ কেবলমাত্র আড়াই বছর কাজ করার সুযোগ পান। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেন। কিন্তু বনি উমাইয়ার

প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের জীবনের মধ্যে তাদের মৃত্যু নিহিত ছিল। কাজেই এ সংস্কারমূলক কাজকে তারা কেমন করে বরদাশত করতে পারতো ! অবশেষে তারা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বিষপান করালেন এবং মাত্র ৩৯ বছর বয়সে দীন ও মিল্লাতের এ নিঃস্বার্থ খাদিম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তিনি যে সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করেছিলেন, তা প্রায় পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। আর শুধুমাত্র বংশানুক্রমিক মনোনয়নের পদ্ধতি খতম করে তদস্থলে নির্বাচন ভিত্তিক খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজটুকু বাকী ছিল। এ সংস্কার পরিকল্পনাটি তাঁর সম্মুখে ছিল। তিনি নিজের এ পরিকল্পনাটি প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সমাজ জীবন থেকে উমাইয়া শাসনের প্রভাব নির্মূল করা এবং সাধারণ মুসলমানদের নৈতিক ও মানসিক অবস্থাকে খিলাফতের বোঝা বহন করার জন্যে তৈরী করা নিতান্ত সহজ ছিল না। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তা সম্পাদিত হতে পারতো না।

চার ইমাম

দ্বিতীয় উমরের (র) ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চাবিকাঠি পুনর্বার ইসলাম থেকে জাহেলিয়াতের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং তিনি যে কার্য সম্পাদন করেছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু তবুও ইসলামী মানসে তিনি যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে তত্ত্বগত আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, তার অগ্রগতি রোধ করার শক্তি কারোর ছিল না। বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসীয়দের বেত্রদণ্ড ও আশরফির থলি এ আন্দোলনের পথরোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের সব জারিজুরি নিষ্ফল হয়। এ আন্দোলনের প্রভাবে কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে, গবেষণা, ইজতিহাদ ও নীতি-নির্দেশ সংকলন ও প্রণয়নের বিরাট কার্য সম্পাদিত হয়। দীনের মূলনীতি থেকে বিস্তারিত ইসলামী আইন প্রণয়ন করা হয় এবং একটি ব্যাপক তমুদ্দুনিক ব্যবস্থাকে ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত করার জন্যে যত প্রকার নিয়মাবলী ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন, খুঁটিনাটি বিষয়সহ তার প্রায় সমস্তই প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে প্রায় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এ কাজ পূর্ণ শক্তিতে চলতে থাকে।

এ যুগের মুজাদ্দিদগণের মধ্যে চারজন ইমামের নামই[১০] উল্লেখযোগ্য। ফিকাহর চারটি মযহাব তাঁদের চারজনের সংগে সম্পর্কিত। তাঁরা ছাড়াও আরো

১০. ইমাম আবু হানিফা (র) ৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তেকাল করেন ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খৃঃ)। ইমাম মালিক (র) জন্মগ্রহণ করেন ৯৫ হিজরীতে (৭১৪ খৃঃ) এবং ইন্তেকাল করেন ১৭৯ হিজরীতে (৭৯৮ খৃ,) ইমাম শাফেয়ী (র) জন্মগ্রহণ করেন ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খৃঃ) এবং ইন্তেকাল করেন ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪ খৃঃ)। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) জন্মগ্রহণ করেন ১৬৪ হিজরীতে (৭৮০ খৃঃ) এবং ইন্তেকাল করেন ২১৪ হিজরীতে (৮৮৫ খৃঃ)।

বহু সংখ্যক মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু যে কারণে তাদের মরতবা মুজতাহিদের পর্যায় থেকে মুজাদ্দিদের পর্যায়ে উন্নীত হয় তাহলো এই ঃ প্রথমত, তাঁরা নিজেদের গভীর দৃষ্টিশক্তি ও অস্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এমন চিন্তাধারার জন্ম দেন, যার বিপুল শক্তি সম্ভার সাত-আট শতাব্দী পর্যন্ত মুজতাহিদ পয়দা করতে থাকে। তাঁরা দীনের মূলনীতিসমূহ থেকে খুঁটিনাটি বিষয়াবলী উদ্ভাবন করার এবং জীবনের বাস্তব বিষয়াবলী শরীয়তের নীতিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার এমন সার্বজনীন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁদের ঐ পদ্ধতির ভিত্তিতেই যাবতীয় ইজতিহাদমূলক কার্যাদি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ সম্পর্কিত কোনো কার্য তাদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত, রাজ সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে তার সবরকম অনুপ্রবেশ মুক্ত হয়ে বরং তার অনুপ্রবেশের তীব্র মোকাবিলা করে তাঁরা এসব কার্য সম্পাদন করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা এমন এমন কষ্ট ভোগ করেন যার কল্পনা করতেও শরীর শিহরিয়ে ওঠে। ইমাম আবু হানিফা (র) বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাস উভয়ের আমলেই বেত্রদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। এমন কি অবশেষে তাঁকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। ইমাম মালিককে (র) আব্বাসীয় বাদশাহ মনসুরের আমলে ৭০ বেত্রদণ্ড দেয়া হয় এবং ভীষণভাবে তাঁকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয় যে, তাঁর হস্তদ্বয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ওপর মামুন, মো'তাসিম ও ওয়াসিক তিনজনের আমলেই অনবরত নির্যাতন চালানো হয়। তাঁকে এতবেশী মারপিট করা হয় যে, সম্ভবতঃ উট এবং হাতীও সে মারের পর জীবিত থাকতে পারতো না। অতপর মুতাওয়াক্কিলের আমলে তাঁর ওপর এত বেশী রাজকীয় পুরস্কার, সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় যে, তিনি ঘাবড়িয়ে চিৎকার করে ওঠেন ঃ

'هذا امر اشد على من ذالك' "ঐ মারপিট এবং কারাদণ্ডের চাইতেও এগুলো আমার ওপর অধিকতর কঠিন বিপদ।" কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ মনীষীগণ দ্বীনী ইলম সংকলন ও প্রণয়নের ব্যাপারে শুধু রাজ প্রভাব ও অনুপ্রবেশের পথরোধই করেননি বরং এমন পদ্ধতির প্রচলন করে যান, যার ফলে পরবর্তীকালে সমস্ত ইজতিহাদমূলক ও মৌলিক রচনার কাজ পূর্ণরূপে রাজ দরবারের প্রভাব মুক্ত থাকে। এরই ফল স্বরূপ আজ ইসলামী আইন এবং কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রের যতগুলো নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বই আমরা লাভ করেছি, তাতে জাহেলিয়াতের সামান্য গন্ধ পর্যন্তও নেই। এ জিনিসগুলো এমনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবয়বে বংশানুক্রমিকভাবে স্থানান্তরিত হয় যে, বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহদের কয়েক শতাব্দীকালীন ইন্দ্রিয় লিপ্সা ও বিলাসিতা এবং

জনসাধারণের নৈতিক অবনতি এবং আকিদা-বিশ্বাস ও তমুদ্দুনিক বিকৃতির যে সয়লাব প্রবাহিত হয়, তা যেন জ্ঞানের এই স্তুপকে স্পর্শও করতে পারেনি এবং তার কোনো প্রভাবও এর ওপর পরিলক্ষিত হয় না।

ইমাম গাজ্জালী (র)

উমর ইবনে আবদুল আযীযের পর রাষ্ট্র ও রাজনীতির লাগাম স্থায়ীভাবে জাহেলিয়াতের হাতে স্থানান্তরিত হয় এবং বনি উমাইয়া, বনি আব্বাস ও তারপর তুর্কী বংশোদ্ভূত বাদশাহদের কর্তৃত্বের যুগ শুরু হয়। এ বাদশাহগণ যে কার্য সম্পাদন করেন, তার সংক্ষিপ্তসার হলো এই যে, একদিকে তারা গ্রীক, রোম ও অনারব দেশের জাহেলী দর্শনসমূহ হুবহু মুসলমানদের মধ্যে চালিয়ে দেন এবং অন্যদিকে নিজেদের অর্থ ও শক্তি বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও সামাজিকতার মধ্যে ইসলাম পূর্ব যুগের জাহেলিয়াতের যাবতীয় বিকৃত ব্যবস্থা ব্যাপক প্রচলন করেন। বনি আব্বাসীয় রাজবংশের অবনতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ আরো বর্ধিত হয়। প্রথম দিকের আব্বাসীয় খলিফাদের পর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষমতা যাদের হাতে স্থানান্তরিত হয়, তারা দীনি ইলম থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। কাজী ও মুফ্‌তির পদে যোগ্যতর লোক নির্বাচন করার যোগ্যতাও তাদের ছিল না। নিজেদের মূর্খতা ও আয়েশ পরস্তির কারণে শরীয়তের নির্দেশাবলী প্রবর্তনের কাজ তারা এমন গতানুগতিক পদ্ধতিতে করতে চাইতেন, যাতে কোনো প্রকার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন না হয়। আর এজন্যে অন্ধ অনুসারিতার পথই ছিল উপযোগী। উপরন্তু স্বার্থবাদী আলেম সমাজ তাদেরকে মযহাবী বিতর্কযুদ্ধ আয়োজনে অভ্যস্ত করে তোলেন। অতপর রাজানুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ ব্যাধি এতদূর বিস্তার লাভ করে যে, এর ফলে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে ফেরকাবাজী, মতবিরোধ ও হানাহানি মহামারির ন্যায় প্রসার লাভ করে। আমীর-ওমরাহ ও বাদশাহদের জন্যে এ মযহাবী বিতর্কযুদ্ধ ছিল মোরগের লড়াই ও কবুতর বাজীর ন্যায় নিছক একটি আমোদ ও বিলাসিতা। কিন্তু সাধারণের জন্যে এটি কাঁচির কাজ করে এবং তাদের দ্বীনি ঐক্যকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। পঞ্চম শতকে পৌঁছতে পৌঁছতে অবস্থা এই পর্যায়ে এসে যায় যে ঃ

১. গ্রীক দর্শনের প্রচারের ফলে আকিদা-বিশ্বাসের বুনিয়াদ নড়ে ওঠে। মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাই তারা দীনকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে বুঝাতে পারতেন না এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আকিদা-বিশ্বাসের গোমরাহীতে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। ন্যায়শাস্ত্রে যারা বিপুল জ্ঞানের অধিকারী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা

কেবল ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না বরং ন্যায়শাস্ত্রেও ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা তাদের ছিল না। তারা গ্রীক দার্শনিকদের দাস ছিলেন। সমালোচনার দৃষ্টিতে এ গ্রীক সাহিত্য পর্যালোচনা করার মতো গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন কোনো লোকও তাদের মধ্যে ছিল না। গ্রীক 'ওহীকে' অপরিবর্তনীয় মনে করে তারা হুবহু তাকে স্বীকার করে নেন এবং আসমানী ওহীকে গ্রীক 'ওহী' অনুযায়ী ঢালাই করার জন্যে তাকে বিকৃত করতে উদ্যোগী হন। এ পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মুসলমান ইসলামকে যুক্তি বিরোধী মনে করতে থাকে। তার প্রত্যেকটি বিষয় তাদের চোখে সন্দেহপূর্ণ হিসাবে প্রতিভাত হয়। তারা মনে করতে থাকে যে, আমাদের দীন লজ্জাবতী লতার ন্যায় স্পর্শকাতর, বুদ্ধির পরীক্ষার সামান্য স্পর্শেই তা ঝিমিয়ে পড়ে। ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী ও তাঁর অনুসারীরা এ ধারার পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। এ দলটি ইলমে কালাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে তাঁরা মোটেই ওয়াকেফহাল ছিলেন না। তাই তাঁরা এ ব্যাপক ও সর্ব পর্যায়ের আকিদা বিকৃতির গতি পরিবর্তন করতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। বরং মোতাজিলাদের প্রতি জিদের বশে তাঁরা এমন অনেক কথা গ্রহণ করেন, যা আসলে দীনী আকিদার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

২. মূর্খ শাসকদের প্রভাবে এবং দীনি ইলমসমূহ বস্তুগত উপায়-উপকরণের সাহায্য বঞ্চিত হবার কারণে ইজতিহাদের ধারা শুকিয়ে যায়, অন্ধ অনুসারিতার ব্যাধি বিস্তারলাভ করে, মযহাবী মতবৈষম্য অধিকতর ব্যাপক ও প্রবল হয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে নতুন নতুন ফেরকা সৃষ্টি করে এবং এসব ফেরকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মুসলমানদেরকে যেন ঃ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ (জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর)-এর পর্যায়ে স্থাপন করে।

৩. পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত মুসলিম জাহানের সর্বত্র নৈতিক অবনতি দেখা দেয়। কোনো একটি শ্রেণীও এর প্রভাবমুক্ত থাকেনি। মুসলমানদের সমাজ জীবন কুরআন ও নবুয়াতের আলোক থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়ে যায়। হেদায়েত ও পথের সন্ধানে খোদার কিতাব এবং রসূলের সুন্নতের দিকে ফিরে আসা উচিত, একথা আলেম সমাজ, আমীর-ওমরাহ ও জনসাধারণ সবাই বিস্মৃত হয়।

৪. রাজদরবারী, রাজপরিবার ও শাসক শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন যাত্রা ও স্বার্থবাদী যুদ্ধের কারণে অধিকাংশ স্থলে প্রজাসাধারণ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল। অবৈধ করের বোঝা তাদের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। যেসব বিদ্যা কৃষ্টি তমুদ্দুনকে প্রকৃতপক্ষে লাভবান করে, সেগুলো ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

রাজ দরবারে যেসব শিল্প মর্যাদাসম্পন্ন ছিল কিন্তু নৈতিক বৃত্তি ও তমুদ্দুনের জন্যে ছিল ধ্বংসকর কেবল সেগুলোরই ডংকা বাজছিল। চারপাশের অবস্থা ও নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছিল যে, ব্যাপক ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী।

পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম গাজ্জালী জন্মগ্রহণ করেন।[১১] সে যুগে যে শিক্ষা পার্থিব উন্নতির বাহন হতে পারতো, প্রথমত, সেই ধরনের শিক্ষা তিনি লাভ করেন। বাজারে যেসব বিদ্যার চাহিদা ছিল, তাতেই তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতপর এ বস্তুকে নিয়ে তিনি ঠিক সেখানেই পৌঁছেন যেখানকার জন্যে এটি তৈরী হয়েছিল এবং তৎকালে একজন আলেম যতদূর উন্নতির কল্পনা করতে পারতেন, ততদূর তিনি পৌঁছে যান।

তিনি তৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদের নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্‌টর নিযুক্ত হন। নেজামুল মুলক তুসী, মালিক শাহ্ সালজুকী ও বাগদাদের "খলিফার" দরবারে যোগ্য আসন লাভ করেন। সমকালীন রাজনীতিতে এতবেশী প্রভাব বিস্তার করেন যে, সালজুকী শাসক ও আব্বাসীয় "খলিফার" মধ্যে সৃষ্ট মতবিরোধ দূর করার জন্যে তাঁর খেদমত হাসিল করা হতো। পার্থিব উন্নতির এ পর্যায়ে উপনীত হবার পর অকস্মাৎ তাঁর জীবনে বিপ্লব আসে। নিজের যুগের তত্ত্বগত, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও তমুদ্দুনিক জীবনধারাকে যত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, ততই তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে এবং ততই তাঁর বিবেক তার স্বরে চীৎকার শুরু করে যে, এই পুঁতিগন্ধময় সমুদ্রে সন্তরণ করা তোমার কাজ নয়, তোমার কাজ অন্য কিছু। অবশেষে সমস্ত রাজকীয় মর্যাদা, লাভ, মুনাফা ও মর্যাদাপূর্ণ কার্যসমূহকে ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করেন। কেননা এগুলোই তার পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়েছিল। অতপর ফকির বেশে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। বনে-জংগলে ও নির্জন স্থানে বসে নিরিবিলিতে চিন্তায় নিমগ্ন হন। বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মুসলমানদের সংগে মেলামেশা করে তাদের জীবনধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। দীর্ঘকাল মোজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন। ৩৮ বছর বয়সে বের হয়ে পূর্ণ দশ বছর পর ৪৮ বছর বয়সে ফিরে আসেন। ওই দীর্ঘকালীন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের পর তিনি যে কার্য সম্পাদন করেন তাহলো এই যে, বাদশাহদের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তাদের মাসোহারা গ্রহণ করা বন্ধ করেন। বিবাদ ও বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকার জন্যে শপথ করেন। সরকারী প্রভাবাধীনে পরিচালিত শিক্ষায়তনসমূহে কাজ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তুসে নিজের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কায়েম

১১. জন্মগ্রহণ করেন ৪৫০ হিজরীতে (১০৫৫ খৃঃ) এবং ৫০৫ হিজরীতে (১১১১ খৃঃ) ইন্তেকাল করেন।

করেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশেষ পদ্ধতিতে তালিম দিয়ে তৈরী করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর এ প্রচেষ্টা কোনো বিরাট বৈপ্লবিক কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়নি, কেননা এ পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে তাঁর আয়ু তাঁকে পাঁচ-ছয় বছরের বেশী অবকাশ দেয়নি।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর সংস্কারমূলক কাজের সংক্ষিপ্তসার হলো এই ঃ

এক. গ্রীক দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর তিনি তার সমালোচনা করেন এবং এমন জবরদস্ত সমালোচনা করেন যে, তার যে শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তা মুসলমানদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং লোকেরা যে সমস্ত মতবাদকে চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিল, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাসমূহকে যার ফলে ছাঁচে ঢালাই করা ছাড়া দীনের উদ্ধারের আর কোনো উপায় পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, তার আসল চেহারা অনেকাংশে জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইমামের এই সমালোচনার প্রভাব শুধু মুসলমান দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ইউরোপে উপনীত হয় এবং সেখানে গ্রীক দর্শনের কর্তৃত্ব খতম করার এবং আধুনিক সমালোচনা ও গবেষণা যুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে।

দুই. ন্যায় শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান না রাখার কারণে ইসলামের সমর্থকগণ দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের মোকাবিলায় যেসব ভুল করছিল তিনি সেগুলো সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের পাদ্রীরা যে ভুল করেছিল ইসলামের এ সমর্থকরা ঠিক সেই পর্যায়ে ভুল করে চলছিল। অর্থাৎ ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণকে কতক সুস্পষ্ট অযৌক্তিক বিষয়াবলীর ওপর নির্ভরশীল মনে করে অযথা সেগুলোকে মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা, অতপর ঐ মনগড়া মূলনীতিগুলোকেও ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে শামিল করে যারা সেগুলো অস্বীকার করে তাদেরকে কাফের গণ্য করা, আর যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ, অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মনগড়া ঐ নীতিগুলোর গলদ প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে ধর্মের জন্যে বিপদ স্বরূপ মনে করা। এ জিনিসটিই ইউরোপকে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মুসলিম দেশসমূহে এ জিনিসটিই বিপুল বিক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করছিল। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী যথাসময়ে এর সংশোধন করেন। তিনি মুসলমানদেরকে জানান যে, অযৌক্তিক বিষয়সমূহের ওপর তোমাদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের প্রমাণ নির্ভরশীল নয় বরং এর পেছনে উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ আছে। কাজেই ঐগুলোর ওপর জোর দেয়া অর্থহীন।

তিন. তিনি ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহের এমন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পেশ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে সে যুগে এবং তার পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত ন্যায়শাস্ত্র ভিত্তিক কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হতে পারতো না। এই সংগে তিনি শরীয়তের নির্দেশাবলী এবং ইবাদতের গূঢ় রহস্য ও যৌক্তিকতাও বর্ণনা করেন এবং এমন একটি চিত্র পেশ করেন যার ফলে ইসলাম যুক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষার বোঝা বহন করতে পারবে না বলে যে ভুল ধারণা মানুষের মনে স্থান লাভ করেছিল, তা বিদূরিত হয়।

চার. তিনি সমকালীন সকল মযহাবী ফেরকা এবং তাদের মতবিরোধ পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ইসলাম ও কুফরের পৃথক-পৃথক সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং কোন্ সীমারেখার মধ্যে মানুষের জন্যে মত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা আছে, কোন্ সীমারেখা অতিক্রম করার অর্থ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, ইসলামের আসল আকিদা-বিশ্বাস কি কি এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে অনর্থক ইসলামী আকিদার মধ্যে শামিল করা হয়েছে তা বিবৃত করেন। তাঁর এ পর্যালোচনার ফলে পরস্পর বিবদমান ও পরস্পরকে কাফের আখ্যাদানকারী ফেরকাসমূহের সুড়ঙ্গের মধ্য হতে অনেক বারুদ বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দৃষ্টিভংগীতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়।

পাঁচ. তিনি দীনের জ্ঞানকে সঞ্জীবিত ও সতেজ করেন। চেতনাবিহীন ধার্মিকতাকে অর্থহীন গণ্য করেন। অন্ধ অনুসৃতির কঠোর বিরোধিতা করেন। জনগণকে পুনর্বার খোদার কিতাব ও রসূলের সুন্নতের উৎস ধারার দিকে আকৃষ্ট করেন। ইজতিহাদের প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এবং নিজের যুগের প্রায় প্রত্যেকটি দলের ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সমালোচনা করে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সংশোধনের আহ্বান জানান।

ছয়. তিনি পুরাতন জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং একটি নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তার মধ্যে দু ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। প্রথমটি হলো এই যে, দীন ও দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথক ছিল। এর ফল স্বরূপ দীন ও দুনিয়ার মধ্যে পৃথকীকরণ দেখা দেয়। ইসলাম এটিকে মূলতঃ ভ্রান্ত মনে করে। দ্বিতীয়টি এই যে, শরীয়তের জ্ঞান হিসাবে এমন অনেক বিষয় পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর ফলে দীন সম্পর্কে জনগণের ধারণা ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় গুরুত্ব অর্জন করার কারণে ফিরকাগত বিরোধ শুরু হয়। ইমাম গাজ্জালী (র) এ গলদগুলো দূর করে একটি সুসামঞ্জস্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর

সমকালীন লোকেরা তাঁর এ মহান কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধিতা করে। কিন্তু অবশেষে সকল মুসলিম দেশে এ নীতি স্বীকৃতি লাভ করে এবং পরবর্তীকালে যতগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তার সবগুলোই ইমাম নির্ধারিত পথেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত আরবী মাদ্রাসাসমূহের কারীকুলামের যে সমস্ত বই শামিল আছে, তার প্রাথমিক নক্‌শা ইমাম গাজ্জালী (র) তৈরী করেন।

সাত. তিনি জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করেন। উলামা, মাশায়েখ, আমির-ওমরাহ, বাদশাহ ও জনসাধারণের প্রত্যেকের জীবন প্রণালী অধ্যয়নের সুযোগ তিনি পান। নিজে পরিভ্রমণ করে প্রাচ্য জগতের একটি অংশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর এহইয়া-উল-উলুম কিতাবটি এই অধ্যয়নের ফল। এ কিতাবে তিনি মুসলমানদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করেন, প্রত্যেকটি দুষ্কৃতির মূল এবং তার মনস্তাত্বিক ও তমুদ্দুনিক কারণসমূহ অনুসন্ধান করেন এবং ইসলামের নির্ভুল ও সত্যিকার নৈতিক মানদণ্ড পেশ করার চেষ্টা করেন।

আট. তিনি সমকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থারও অবাধ সমালোচনা করেন। সমকালীন শাসক গোষ্ঠীকেও সরাসরি সংশোধনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন এবং এ সংগে জনগণের মধ্যেও যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখে স্বেচ্ছায় নত না হয়ে অবাধ সমালোচনা করার প্রেরণা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। 'এহইয়া-উল-উলুম' এর একস্থানে লেখেন ঃ 'আমাদের জামানার সুলতানদের সমস্ত বা অধিকাংশ ধন-সম্পদ হারাম।' আর একস্থানে লেখেন, "এ সুলতানদের নিজেদের চেহারা অন্যকে না দেখানো উচিত এবং অন্যদের চেহারা না দেখা উচিত। এদের যুলুমকে ঘৃণা করা, এদের অস্তিত্বকে পছন্দ না করা, এদের সংগে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখা এবং এদের সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের থেকেও দূরে অবস্থান করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য।" অপর একস্থানে দরবারে প্রচলিত আদব-কায়দা ও বাদশাহ পূজার সমালোচনা করেন এবং বাদশাহ ও আমির-ওমরাহর অনুসৃত সামাজিক রীতিনীতির নিন্দা করেন, এমনকি তাদের দালান-কোঠা, পোশাক-পরিচ্ছদ গৃহের সাজসরঞ্জাম সব কিছুকেই নাপাক গণ্য করেন। শুধু এখানেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তিনি নিজের যুগের বাদশাহদের নিকট একটি বিস্তারিত পত্র লেখেন। পত্রের মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম প্রবর্তিত রাষ্ট্র পদ্ধতির দিকে আহ্বান জানান, শাসকের দায়িত্ব বুঝান এবং তাঁকে জানান যে, তাঁর দেশে যে যুলুম হচ্ছে তা তিনি নিজেই করেন বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা করেন, সবকিছুর জন্যে তিনিই দায়ী। একবার বাধ্য হয়ে রাজ দরবারে যেতে হয়, তখন আলোচনা প্রসংগে বাদশাহর মুখের ওপর বলেন ঃ

"স্বর্ণ অলংকারের ভারে তোমার ঘোড়ার পিঠ ভাঙেনি তো কি হয়েছে, অনাহার-অর্ধাহারে মুসলমানদের পিঠতো ভেঙে গিয়েছে।"

তাঁর শেষ যুগে যে সকল উজির নিযুক্ত হন, তাদের প্রায় সবার নিকট তিনি পত্র লেখেন এবং জনগণের দূরবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনৈক উজিরকে লেখেন ঃ

"যুলুম সীমা অতিক্রম করেছে। যেহেতু আমাকে স্বচক্ষে এসব দর্শন করতে হতো, তাই নির্লজ্জ ও নির্দয় যালেমদের কীর্তিকলাপ প্রত্যক্ষ না করার জন্যে প্রায় এক বছর থেকে আমি তুসের আবাস উঠিয়ে নিয়েছি।"

ইবনে খালদুনের বর্ণনা মতে এতদূর জানা যায় যে, তিনি পৃথিবীর যে কোনো এলাকাতেই হোক না কেন, নির্ভেজাল ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করতেন। কাজেই তাঁর ইংগিতেই দূর প্রতীচ্যে (আফ্রিকায়) তাঁর জনৈক ছাত্র "মুওয়াহিদ" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইমাম গাজ্জালীর কর্মকাণ্ডে এই রাজনৈতিক রূপ ও রং নেহাতই গৌণ ছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্যে তিনি কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাননি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হননি। তাঁর পরবর্তীকালে জাহেলিয়াতের কর্তৃত্বাধীনে মুসলিম জাতি-সমূহের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি এক শতাব্দীর পর তাতারীরা তুফানের ন্যায় মুসলিম দেশসমূহের ওপর দিয়ে ছুটে চলে এবং তাদের সমগ্র তমুদ্দুনকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

ইমাম গাজ্জালীর (র) সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে কতিপয় তত্ত্ব ও চিন্তাগত ত্রুটিও ছিল। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হবার কারণে তাঁর কার্যাবলীতে এক ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়।[১২] দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর যুক্তিবাদীতা ও ন্যায় শাস্ত্রের কর্তৃত্বের কারণে সৃষ্টি হয়। তৃতীয় ধরনের ত্রুটির উৎপত্তি হয় তাসাউফের দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ার কারণে।

এ দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে ইমাম গাজ্জালী (র)-এর আসল কাজ অর্থাৎ ইসলামের চিন্তাগত ও নৈতিক প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করার এবং বেদআত ও গোমরাহির নিদর্শনসমূহ চিন্তা জগত ও তমুদ্দুনিক জীবনধারা থেকে ছাঁটাই করার কাজকে যিনি অগ্রসর করেন তিনি হচ্ছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)।

১২. ইমাম গাজ্জালী তাঁর এহইয়া-উল-উলুম কিতাবে এমন অনেক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যে গুলোর সনদ পাওয়া যায় না, তাজুদ্দিন সাবাকী তাঁর তাবকাতে শাফেঈয়ায় সেগুলো একত্রিত করেছেন।-(দেখুন-তাবকাত চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫ থেকে ১৮২)

ইবনে তাইমিয়া (র)

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর দেড়শো বছর পর হিজরী সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) জন্মগ্রহণ[১৩] করেন। তখন তাতারীদের হামলায় সিন্ধু নদ থেকে নিয়ে ফোরাত নদীর তীরভূমি পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে মুসলিম জাতি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অনবরত পঞ্চাশ বছরের এ পরাজয়, নিরবচ্ছিন্ন আতংক, অশান্তি ও বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থা এবং বিদ্যা, সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহের ধ্বংস মুসলমানদেরকে অবনতির অতল গহ্বরে নামিয়ে দিয়েছিল। ইমাম গাজ্জালীও তাদের মধ্যে এতটা অবনতি প্রত্যক্ষ করেননি। নয়া তাতারী আক্রমণকারীরা যদিও ইসলাম কবুল করেছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের ব্যাপারে এ শাসকগণ এদের পূর্ববর্তী তুর্কী শাসকদের চাইতে কয়েক পদ অগ্রসর ছিল। তাদের প্রভাবাধীনে এসে জনগণ, আলেম সমাজ, মাশায়েখ, ফকিহ ও কাজীগণের নৈতিক চরিত্র আরো বেশী অধঃপতিত হতে থাকে।[১৪] অন্ধ অনুসৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার ফলে বিভিন্ন ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্রভিত্তিক মযহাবসমূহ যেন স্বতন্ত্র

---

১৩. ৬৬১ হিজরীতে (১২৬২ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তেকাল করেন ৭২৮ হিজরীতে (১৩২৭ খৃঃ)

১৪. তৎকালীন আলেম সমাজের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, হালাকু খান বাগদাদ দখল করার পর আলেমদের নিকট ন্যায়পরায়ণ কাফের সুলতান ও যালেম মুসলিম সুলতানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে ফতোয়া তলব করলে আলেম সমাজ নির্বিবাদে ফতোয়া দিয়ে বসেন যে, ন্যায়পরায়ণ কাফের সুলতান যালেম মুসলিম সুলতানের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তৎকালীন সমাজনায়কদের অবস্থা ছিল ঃ তাতারীদের ধ্বংস অভিযান থেকে মুসলমানদের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র মিসর ও সিরিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেছিল। এ রাষ্ট্রদ্বয়ের আইন-কানুন দু ভাগে বিভক্ত ছিল। এক, ব্যক্তি সম্পর্কিত আইন। এর কার্য ক্ষেত্র ছিল কেবল বিবাহ, তালাক, মিরাছ প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। এসব ব্যাপারে শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা হতো। দুই. রাষ্ট্রীয় আইন। এ আইন দেওয়ানী ও দেশের সমস্ত ব্যবস্থার ওপর কার্যকরী ছিল। এর ভিত্তি স্থাপিত ছিল পুরোপুরি চেংগিজী নিয়ম পদ্ধতির ওপর। উপরন্তু দেশে শরীয়তের যতটুকুন ব্যক্তি সম্পর্কিত আইনের প্রচলন ছিল তা ছিল শুধুমাত্র জনগণের জন্য। আর শাসক সমাজ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শরীয়তে মুহাম্মদীর পরিবর্তে চেংগিজী আইনের আনুগত্য করতো। তাদের অনৈসলামী দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে শুধু এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, মেকরিজির বর্ণনা মতে তারা নিজেদের রাষ্ট্র সীমার মধ্যে বেশ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপক অনুমতি দান করেছিল। পতিতাদের ওপর তারা কর ধার্য করেছিল এবং সেই কর বাবদ যাবতীয় অর্থ 'ইসলামী রাষ্ট্রের' কোষাগারে জমা হতো। ইবনে তাইমিয়ার সমকালীন আলেম ও সুফীগণের অধিকাংশই এসব সরকারের বৃত্তিভোগী ছিল। আল্লাহর দীনের এই মযলুম অবস্থা তাদের মনে মুহূর্তের জন্যেও ভাবান্তর সৃষ্টি করেনি। তবে যখন ইবনে তাইমিয়া অবস্থার সংশোধনে অগ্রসর হলেন, তখন আচানক তাদের 'ইসলামী জোশ' জেগে উঠলো এবং ফতোয়া দিতে শুরু করলো যে, এ ব্যক্তি নিজে গোমরাহ এবং মানুষকে গোমরাহ করছে। এ ব্যক্তি খোদার দেহ আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। এ ব্যক্তি তাসাউফ ও তাসাউফ পন্থীদের শত্রু। এ ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণের সমালোচনা করে। এ ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করছে। এর পেছনে নামায পড়া জায়েয নয় এবং এর সমস্ত কিতাব জ্বালিয়ে দেয়া উচিত।

দীনে পরিণত হয়।[১৫] ইজতিহাদ গোনাহে পরিণত হয়। বেদআত ও পৌরানিক বিষয়াবলী শরীয়তের বিধানে পরিণত হয়। কুরআন সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা অমার্জনীয় গোনাহ বলে বিবেচিত হয়। তৎকালে অশিক্ষিত ও গোমরাহ জনসাধারণ, দুনিয়া পূজারী বা সংকীর্ণমনা আলেম সমাজ ও মূর্খ যালেম শাসক শ্রেণীর ত্রয়ী সম্মিলন এমন জোরদার ফৌজদারী হয়ে ওঠে যে, এ সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে কারোর সংস্কার ও সংশোধনের প্রোগ্রাম নিয়ে অগ্রসর হওয়া কসাইর ছুরির নীচে নিজের গলা বাড়িয়ে দেয়ার চাইতে কিছু কম ছিল না। এ কারণেই যদিও তখন নির্ভুল চিন্তার অধিকারী, ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সত্য উপলব্ধিকারী ওলামার অভাব ছিল না এবং হকের পথে অগ্রসর সত্যানুসারী ও আসল সূফীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেই অন্ধকার যুগে সংস্কারের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার সাহস একজন মাত্র আল্লাহর বান্দার হয়েছিল।

ইবনে তাইমিয়া (র) কুরআনে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এমন কি হাফেজ যাহবী (র) সাক্ষ্য দেন যে, اما التفسير فمسلم اليه –তাফসীরে তো ইবনে তাইমিয়া (র) বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন। এমন কি বলা হয় كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث (যে হাদীসটি ইবনে তাইমিয়া জানেন না, সেটি আদতে হাদীসই নয়)। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, নিসন্দেহে তিনি স্বতন্ত্র মুজতাহিদের মর্যাদা লাভ করেন। যুক্তি শাস্ত্র ও কালাম শাস্ত্রে তাঁর দৃষ্টি এত গভীর ছিল যে, সমকালীন আলেমদের মধ্যে এসব শাস্ত্রে নিজেদের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে যাঁদের গর্ব ছিল তাঁরাও তাঁর নিকট শিশুবৎ গণ্য হতেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাহিত্য, তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে, গোল্ড জিহারের মতে যে ব্যক্তি তাওরাতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়, তাকে অবশ্যি ইবনে তাইমিয়ার গবেষণার মুখাপেক্ষী হতে হবে। এসব গভীর তত্ত্বজ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর সাহস ও হিম্মতেরও তুলনা ছিল না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো কোনো বৃহত্তর শক্তিকে তিনি ভয় করেননি। এমন কি এজন্যে বহুবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং অবশেষে কারাগারেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এ জন্যে ইমাম গাজ্জালী (র)-এর পরিত্যক্ত কাজকে তিনি অধিকতর নিপুণতার সাথে অগ্রবর্তী করতে সক্ষম হন।

১৫. এ পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্যেও শুধু একটি নমুনা যথেষ্ট। দামেস্কে একটি মাদ্রাসার (মাদ্রাসায়ে রাওয়াছিয়া) প্রতিষ্ঠাতা নিজের ওয়াক্ফনামায় লিখে রেখেছিলেন যে, এ মাদ্রাসায় ঈসায়ী, ইহুদী ও হাম্বলীরা ভর্তি হতে পারবে না। এ থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, ফিকাহ ও কালামের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল, যার ফলে একজন শাফেয়ী ও আশয়ারী (কালাম শাস্ত্রের জনৈক ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর সমর্থক) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারীদেরকে ইহুদী ও ঈসায়ীদের সাথে শামিল করতে দ্বিধা করতেন না।

ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সংস্কারমূলক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ

১. তিনি ইমাম গাজ্জালীর চাইতেও অনেক বেশী কঠোর ও তীব্রভাবে গ্রীক যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের সমালোচনা করেন এবং তার দুর্বলতাসমূহ এমনভাবে প্রকাশ করেন যার ফলে যুক্তি ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তার আধিপত্য চিরকালের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ইমামদ্বয়ের সমালোচনার প্রভাব কেবল প্রাচ্য দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা পাশ্চাত্যেও পৌঁছে। কাজেই ইউরোপে এরিষ্টটলের যুক্তিবাদিতা ও খৃষ্টান ভাষ্যকারগণের গ্রীক প্রভাবিত দার্শনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সমালোচনার আওয়াজ ওঠে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আড়াইশো বছর পর।

২. ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের সমর্থনে তিনি এমন জোরদার যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করেন, যা ইমাম গাজ্জালীর যুক্তি-প্রমাণের চাইতেও বেশী বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল এবং ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তির ধারক হবার দিক দিয়েও তাঁর থেকে অনেক বেশী অগ্রবর্তী ছিল। ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বর্ণনা ও যুক্তি নির্ণয়ের ওপর পারিভাষিক যুক্তি শাস্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। ইবনে তাইমিয়া (র) এ পথ পরিহার করে সাধারণ জ্ঞানের ওপর বর্ণনা, প্রকাশ ভংগী ও যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তিস্থাপন করেন। এটিই অধিকতর স্বাভাবিক, অধিকতর প্রভাবশালী এবং কুরআন ও সুন্নাতের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। এ নতুন পথটি পূর্ববর্তী পথগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। যাঁরা দীনের ধারক ও বাহক ছিলেন, তাঁরা কেবলমাত্র শরীয়তের নির্দেশাবলী উদ্ধৃত করতেন, সেগুলো বুঝাতে পারতেন না। আর যাঁরা কালাম শাস্ত্রের গোলক ধাঁধায় আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা দর্শন শাস্ত্রের কচকচি ও পারিভাষিক যুক্তিশাস্ত্রের মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করার কারণে কুরআন ও সুন্নাতের উচ্চতর প্রাণবস্তুকে কমবেশী হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইবনে তাইমিয়া (র) ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও শরীয়তের নির্দেশাবলীকে তার আসল প্রাণবস্তুসহ পুরোপুরি বিবৃত করেন। অতপর সেগুলো বুঝাবার জন্যে এমন সোজা ও স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেন, যার সম্মুখে মাথানত করা ছাড়া বুদ্ধির জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। ইমামের এ মহান কার্যের প্রশংসা করতে গিয়ে হাদীসের ইমাম আল্লামা যাহাবী বলেন ঃ

ولقد فصر السنة المحضة والطريقة السلفية واستج لها براهين ومقد مات وامور لم يسبق اليها ـ

অর্থাৎ 'ইবনে তাইমিয়া নির্ভেজাল সুন্নাত ও পূর্ববর্তীগণের পদ্ধতি সমর্থন করেন এবং এর সমর্থনে এমন সব যুক্তি-প্রমাণ ও এমন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন যার দিকে ইতিপূর্বে কারোর দৃষ্টি পড়েনি।'

৩. তিনি শুধু অন্ধ অনুসৃতির প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি বরং ইসলামের প্রথম যুগের মুজাহিদগণের অনুসৃত পথে ইজতিহাদ করেও দেখিয়ে দেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের জীবন থেকে সরাসরি প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন ফিকাহ ভিত্তিক মযহাবের মতবিরোধের স্বাধীন ও ন্যায় ভিত্তিক পর্যালোচনা করে অসংখ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। এর ফলে ইজতিহাদের পথ নতুন-ভাবে আবিষ্কৃত হয় এবং লোকেরা ইজতিহাদ শক্তির ব্যবহার পদ্ধতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই সংগে তিনি ও তাঁর মহান শাগরিদ ইবনে কাইয়েম শরীয়তের হিকমত এবং নবী করীম (স)-এর আইন প্রণয়ন পদ্ধতির ওপর এমন সূক্ষ্ম গবেষণা কার্য সম্পাদন করেন যে, তার দৃষ্টান্ত শরীয়তের ইতিপূর্বেকার সাহিত্যে বিরল। তাঁদের পর যাঁরা ইজতিহাদ করেছেন তাঁদের জন্যে এ সাহিত্য উত্তম পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে।

৪. তিনি বেদআত, মুশরিকী রসম রেওয়াজ এবং আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। এজন্যে তিনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। ইসলামের পরিষ্কার ঝরণাধারায় এ পর্যন্ত যতগুলো অস্বচ্ছ স্রোতের মিশ্রণ ঘটেছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার কোনো একটিকেও নিষ্কৃতি দেননি। তাদের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সংগ্রাম চালান এবং প্রত্যেকটিকে ছেঁটে বের করে দিয়ে নির্জলা ইসলামের পদ্ধতিকে পৃথকভাবে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করেন। এ সমালোচনা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি। বিরাট খ্যাতিমান ও কীর্তিমান পুরুষ—যাদের খ্যাতি ও কীর্তির ডংকা সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় বাজতো, যাঁদের নাম শুনে মানুষের মাথা নত হয়ে আসতো—তাঁরাও ইবনে তাইমিয়ার সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। এমন অনেক কার্য ও পদ্ধতি যা, শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যাদের বৈধতা বরং মুস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ তৈরী করা হয়েছিল এবং হকপরস্ত আলেম সমাজও যে ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিলেন, ইমাম ইবনে তাইমিয়া সেগুলোকে পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী হিসেবে পরিগণিত করেন এবং জোরেশোরে তাদের বিরোধিতা করেন। এই মুক্ত ও সত্য কথনের কারণে দুনিয়ার একটি বিপুল বিরাট অংশ তাঁর শত্রুতে পরিণত হয় এবং তাদের শত্রুতার জের আজো চলে আসছে। তাঁর সমকালীন লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে তাঁকে একাধিকবার কারাগারে পাঠান, আর পরবর্তীগণ তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ও গোমরাহির ফতোয়া প্রদান করে নিজেদের কলিজা ঠাণ্ডা করেন। কিন্তু নির্ভেজাল ও সত্যিকার ইসলামের আনুগত্যের যে শিংগা তিনি ফুঁকেছিলেন তার বদৌলতে সমগ্র দুনিয়ায় একটি স্থায়ী আলোড়ন সৃষ্টি হয়—তার প্রতিধ্বনি আজও শ্রুত হচ্ছে।

এ সংস্কারমূলক কার্যাবলীর সাথে সাথে তিনি তাতারীদের বর্বরতা ও পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সংগ্রাম ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হন। তৎকালে মিসর ও সিরিয়া এ সয়লাবের আওতামুক্ত ছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সেখানকার সাধারণ মুসলমান ও বিত্তশালীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলেন এবং তাদেরকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ করেন। তাঁর সমকালীন লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানেরা তাতারীদের ভয়ে এতই সন্ত্রস্ত থাকতো যে, তাদের নাম শুনেই কেঁপে উঠতো এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে ভয় করতো। كانما يساقون الى الموت কিন্তু ইবনে তাইমিয়া তাদের মধ্যে জেহাদের আগুন প্রজ্বলিত করে তাদের সুপ্ত বীরত্বকে জাগ্রত করেন। তবুও একথা সত্য যে, তিনি এমন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হননি, যার ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সূচিত হতো এবং কর্তৃত্বের চাবিকাঠি জাহেলিয়াতের হাত থেকে ইসলামের হাতে স্থানান্তরিত হতো।

শায়খ আহমদ সরহিন্দী (র)

হিজরী সপ্তম শতকে তাতারী ফিতনা হিন্দুকুশ পর্বতের ওদিকের সমগ্র ভূখণ্ডকে নেস্তনাবুদ করে দেয়, কিন্তু হিন্দুস্তান তার অশুভ ছোবল থেকে রেহাই পায়। ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কারণে এখানকার সুধী ও নেতৃ সমাজের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ ব্যক্তিরা হামেশাই এ ভ্রান্ত ধারণার সম্মুখীন হয়েছে। খোরাসান ও ইরাকের যাবতীয় দুষ্কৃতি এখানে লালিত হতে থাকে। এখানেও চলে বাদশাহের খোদায়ী কর্তৃত্ব। আমির ওমরাহ ও বিত্তশালীদের বিলাসিতা, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন ও অন্যায় পথে ব্যয় এবং যুলুম নির্যাতনের রাজত্ব অবাধে চলতে থাকে। খোদা সম্পর্কে গাফলতি ও দীনের সহজ-সরল পথ থেকে দূরে অবস্থান করার নীতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে বাদশাহ আকবরের শাসনামলে পৌঁছে গোমরাহী তার শেষ সীমান্তে উপনীত হয়।

আকবরের দরবারে এ ধারণা অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে, ইসলাম মূর্খ ও অশিক্ষিত বুদ্ধুদের মধ্যে জন্মলাভ করেছিল। তা কোনো সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উপযোগী নয়। নবুয়াত, ওহি, হাশর-নশর, বেহেশত ও দোযখ প্রভৃতি ইসলামের মূল আকিদা-বিশ্বাসসমূহ বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত হয়। কুরআন খোদার কালাম হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হয়। ওহির অবতরণ বুদ্ধি বিরোধী গণ্য হয়। মৃত্যুর পর শাস্তি ও পুরস্কার অনিশ্চিত বলে বিবেচিত হয়। তবে জন্মান্তরবাদ সকল দিক দিয়েই সম্ভবপর ও সত্য বলে

গৃহীত হয়। নবীর মিরাজকে প্রকাশ্যে অসম্ভব গণ্য করা হয়। নবী করীম (স)-এর ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে তাঁর সহধর্মিনীদের সংখ্যা ও তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জেহাদসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আপত্তি করা হয়। এমন কি 'আহমদ' ও 'মুহাম্মদ' শব্দও বিরক্তিকর ঠেকে এবং যাদের নামের সাথে ঐ শব্দদ্বয় যুক্ত ছিল, তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়। স্বার্থবাদী আলেমগণ নিজেদের বইপত্রের ভূমিকায় নাত লেখা বন্ধ করে। অনেক যালেম গোস্তাখীর চরম সীমানায় উপনীত হয়ে দাজ্জালের চিহ্নসমূহ মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে আবিষ্কার করে العياذ بالله العياذ بالله শাহী দেওয়ানখানায় নামায পড়ার মতো বুকের পাটা কারোর ছিল না। আবুল ফজল নামায, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী ঐহিত্যের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি উত্থাপন করে এবং এগুলোকে উপহাস করে। কবিকুল এসব ঐতিহ্যের নিন্দাবাদে কাব্য রচনা করে। এসব কাব্য-কবিতা সাধারণ মানুষের নিকটও পৌঁছায়।

বাহাই মতবাদের ভিত্তিও আসলে আকবরের জামানায় স্থাপিত হয়। এ সময়েই এ মত পেশ করা হয় যে, মুহাম্মদ (স)-এর এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ দীনের মেয়াদও ছিল এক হাজার বছর। তাই বর্তমানে এ দীন বাতিল হয়ে গেছে এবং এর স্থলে এখন নতুন দীনের প্রয়োজন। মুদ্রার মাধ্যমে এ মতবাদের প্রচার শুরু হয়। কেননা সে যুগে এটিই ছিল প্রচারণার সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম। অতপর একটি নয়া দীন ও একটি নয়া শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মকে মিলিয়ে একটি মিশ্রিত নতুন ধর্ম তৈরী করা যাতে করে সরকারের শাসন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। দরবারের তোষামোদকারী হিন্দুরা নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতে থাকে যে, অমুক যুগে একজন গোরক্ষক মহাত্মা বাদশাহ জন্মলাভ করবেন। অনুরূপভাবে অর্থ পূজারী আলেমগণও আকবরকে মেহদী, যুগস্রষ্টা, মুজতাহিদ, ইমাম প্রভৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করে। জনৈক 'তাজুল আরেফিন' সাহেব এতদূর অগ্রসর হন যে, তিনি আকবরকে আদর্শ মানব ও যুগ নেতা হবার কারণে তাঁকে খোদার প্রতিবিম্ব বলে প্রচার করেন। সাধারণ মানুষকে বুঝাবার জন্যে বলা হয় যে, সত্য ও সততা (বিশ্বজনীন সত্য) দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যেই আছে। কোনো একটি মাত্র ধর্ম সত্যের ইজারাদার নয়। কাজেই সকল ধর্মে যেসব সত্য আছে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি পূর্ণাংগ পদ্ধতি প্রণয়ন করা উচিত। জনগণকে ব্যাপকভাবে সেদিকে আহ্বান করতে হবে, যাতে করে সকল ধর্মের বিরোধের অবসান ঘটে। এ পূর্ণাংগ পদ্ধতির নাম 'দীনে ইলাহী'। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু,

আকবর খলিফাতুল্লাহ'। এই নতুন ধর্মের কালেমা নির্ধারিত হয়। যারা নতুন ধর্মে প্রবেশ করতো, তাদেরকে তাদের পিতা-প্রপিতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত দীন ইসলাম থেকে তওবা করে 'দীনে ইলাহী আকবর শাহী'–এর মধ্যে প্রবেশ করতে হতো। আর দীনে ইলাহীতে প্রবেশ করার পর তাদেরকে 'চেলা' আখ্যা দেয়া হতো। সালামের পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়ম করা হয় যে, সালামকারী 'আল্লাহু আকবর' ও জবাবদাতা 'জাল্লে জালালুহু' বলবে। মনে রাখবেন, বাদশাহর নাম জালালুদ্দিন ও তাঁর উপাধি ছিল 'আকবর'। চেলাদেরকে বাদশাহর চিত্র দেয়া হতো, তারা সেটি পাগড়ির গায় লাগিয়ে রাখতো। রাজপূজা এ ধর্মের একটি অংশ ছিল। প্রত্যেক দিন সকালে বাদশাহর দর্শন লাভ করা হতো। বাদশাহকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করার পর তাঁকে সিজদা করা হতো। আলেম ও সুফিগণ তাঁদের কামনা-বাসনা পূরণের এ কেবলা ও কাবাকে বেধড়ক সিজদা করতো এবং এ সুস্পষ্ট শের্ককে 'সম্মানের সিজদা' ও 'মৃত্তিকা চুম্বন'-এর ন্যায় শব্দের আবরণে ঢেকে রাখতো। নবী (স) এ অভিশপ্ত বাহানাবাজী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা হারাম জিনিসের নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল বলে গণ্য করবে।

এ নতুন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করার সময় বলা হয়েছিল যে, পক্ষপাতহীন-ভাবে সকল ধর্মের ভালো কথাগুলো এতে গ্রহণ করা হবে ; কিন্তু আসলে ইসলাম ছাড়া প্রত্যেক ধর্মের এতে স্থান হয়। এবং একমাত্র ইসলাম ও ইসলামী আইন কানুনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে অগ্নি পূজাকে গ্রহণ করা হয়। আকবরী মহলে চিরস্থায়ী আগুন জ্বালানো হয় এবং বাতি জ্বালাবার সময় সম্মানের সংগে দাঁড়াবার নীতি প্রচলন করা হয়। ঈসায়ীদের নিকট থেকে ঘন্টা বাজানো, তিন প্রভুর প্রতিকৃতির পূজা এবং এ ধরনের কতিপয় জিনিস গ্রহণ করা হয়। সবচাইতে বেশী মেহেরবানী করা হয় হিন্দু ধর্মের ওপর। কেননা এটি ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম এবং রাজশাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্যে একে তোয়াজ করার প্রয়োজন ছিল। কাজেই গরুর গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়। হিন্দুদের উৎসবসমূহ যেমন ঃ দেওয়ালী, দশোহারা, রাখী, পূণম, শিবরাত্রি প্রভৃতিকে পূর্ণ হিন্দুরীতি অনুযায়ী পালন করার ব্যবস্থা করা হয়। রাজমহলে প্রতিদিন 'হাওয়ান' অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতিদিন চার বার সূর্যোপাসনা করা হতো। সূর্যের এক হাজার নাম জপ করা হতো। সূর্যের নাম উচ্চারিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বলা হতো, 'তার শক্তি মহান'। কপালে তিলক লাগানো হতো। কোমর ও কাঁধে পৈতা বাঁধা হতো। গরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে তাদের অন্যান্য বহু আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে

শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের সাথে এ ব্যবহার করা হয়। আর ইসলামের ব্যাপারে বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদের প্রতিটি কার্যই প্রমাণ করছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে দরবারের মেজাজ অনুযায়ী দার্শনিক ও সুফিদের ভাষায় ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কথা পেশ করা হতো, তাকে আসমানি ওহি মনে করা হতো এবং তার মোকাবিলায় ইসলামী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা হতো। মুসলমান আলেমগণ যদি ইসলামের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতেন অথবা কোনো গোমরাহির বিরোধিতা করতেন, তাদেরকে 'ফকিহ' আখ্যা দান করা হতো। তাদের বিশেষ পরিভাষায় এর অর্থ ছিল নির্বোধ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন হয় না। ধর্মসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্যে চল্লিশ ব্যক্তির একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অত্যন্ত উদারতা ও ভক্তির সংগে বিভিন্ন ধর্মসমূহ অধ্যয়ন করে কিন্তু ইসলামের নাম উঠতেই তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করা হতো ; আর কোনো ইসলাম সমর্থক এর জবাব দিতে চাইলে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো। ইসলামের সঙ্গে শুধু এ আচরণ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং কার্যতঃ প্রকাশ্যে ও ব্যাপকভাবে ইসলামী নির্দেশাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। সুদ, জুয়া ও শরাবকে হালাল করা হয়। নওরোজ উৎসবে রাজ সভায় শরাব ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। এমন কি কাজী ও মুফতি পর্যন্ত শরাব পান করে ফেলতো। দাঁড়ি চেঁছে ফেলার ফ্যাশন প্রবর্তন করা হয় এবং বৈধতার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়। চাচাত ও মামাত বোনদের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পুরুষদের জন্যে ১৬ বছর ও মেয়েদের জন্যে ১৪ বছর বিয়ের বয়স নির্ধারিত হয়। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ গণ্য করা হয়। সিংহ ও বাঘের গোশত হালাল ঘোষণা করা হয় এবং ইসলামের প্রতি জিদের বশবর্তী হয়ে শূকরকে শুধু পাকই নয় বরং একটি অতি পবিত্র প্রাণী বলে ঘোষণা করা হয়। এমন কি সকালে বিছানা ছেড়ে সর্বপ্রথম শূকর দর্শনকে বড়ই মোবারক মনে করা হতো। মৃত দেহকে কবরস্থ করার পরিবর্তে পুড়িয়ে ফেলা বা পানিতে ভাসিয়ে দেয়াকে ভালো গণ্য করা হয়। আর যদি কেউ একান্তই কবরস্থ করতে চাইতো তাহলে পদদ্বয় কেবলার দিকে স্থাপন করার জন্যে তাকে পরামর্শ দেয়া হতো। আকবর নিজেও ইসলামের প্রতি জিদের বশবর্তী হয়ে পদদ্বয় কেবলার দিকে রেখে শয়ন করতেন। সরকারের শিক্ষানীতিও পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ছিলো। আরবী ভাষা শিক্ষা এবং ফিকাহ ও হাদীস অধ্যয়নকে অপছন্দ করা হতো। যারা এসব বিদ্যা অর্জন করতো তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করা হতো। দীনি এলমের পরিবর্তে দর্শন, তর্কশাস্ত্র, অংক, ইতিহাস ও এ ধরনের অন্যান্য বিদ্যাসমূহ সরকারী সাহায্য লাভ করে।

ভাষার মধ্যে হিন্দী রীতি সৃষ্টি করার দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আরবী শব্দাবলীকে ভাষার চৌহদ্দি থেকে বহিষ্কৃত করারও প্রস্তাব ছিলো। এ অবস্থায় দীনি মাদ্রাসাগুলো ছাত্র শূন্য হয়ে যেতে থাকে এবং অধিকাংশ আলেম দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে।

এ ছিল সরকারের অবস্থা। অন্যদিকে জনগণের অবস্থাও এর চাইতে মোটেই উন্নত ছিল না। বিদেশাগতরা ইরান ও খোরাসানের নৈতিক ও আকিদাগত ব্যাধি সঙ্গে করে এনেছিলো। আর যারা ভারতে মুসলমান হয়ে ছিল, তাদের ইসলামী শিক্ষা ও অনুশীলনের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তাই তারা পুরাতন জাহেলিয়াতের বহু রীতি-পদ্ধতি তাদের চিন্তা ও বাস্তব জীবনে ধারণ করেছিল। এ দু ধরনের মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক অদ্ভূত মিশ্রণ তৈরী হয়েছিল। তার নাম দেয়া হয়েছিল, 'ইসলামী তমুদ্দুন'। তাতে শের্কের সংমিশ্রণ ছিল, বংশ ও শ্রেণী ভেদ ছিল, কাল্পনিক ও পৌরাণিক চিন্তা-ধারণা ছিল এবং নব আবিষ্কৃত রসম-রেওয়াজ সম্বলিত একটি নতুন শরীয়তও ছিল। দুনিয়া পূজারী ওলামা ও মাশায়েখগণ শুধু এ অদ্ভূত মিশ্রণটির সাথে সহযোগিতা করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং তারা এই নতুন 'মত'-এর পৌরহিত্যও গ্রহণ করেছিল। জনসাধারণ তাদেরকে নজরানা পেশ করতো আর তারা জনগণকে মযহাবী বিরোধের তোহফা দান করতো।

পীর সাহেবানদের মাধ্যমে আর একটি রোগও বিস্তার লাভ করেছিল। নয়া প্লেটোবাদ, বৈরাগ্যবাদ (Stoicism), মনুবাদ ও বেদান্তবাদের সংমিশ্রণে এক অদ্ভূত ধরনের দর্শন ভিত্তিক তাসাউফ জন্মলাভ করে। ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ব্যবস্থায় তাকে স্থান দেয়া হয়। তরিকত ও হকিকতকে ইসলামী শরীয়ত থেকে পৃথক এবং তার থেকে মুখাপেক্ষীহীন গণ্য করা হয়। বাতেনের এলাকা জাহের থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। এ এলাকার আইনে হালাল ও হারামের সীমানা বিলুপ্ত ইসলামী বিধি-নিষেধসমূহ কার্যতঃ বাতিল এবং সমস্ত ক্ষমতা ইন্দ্রিয় লিপ্সার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ইচ্ছা মতো কোনো হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা ছিল এ আইনের বৈশিষ্ট্য। এ সাধারণ পীরদের থেকে যার অবস্থা ভালো ছিল সেও কমবেশী ঐ দর্শন ভিত্তিক তাসাউফ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বিশেষ করে সর্বেশ্বরবাদের ভ্রান্ত ধারণা সমস্ত কর্মক্ষমতা হরণ করে নেয়।

এহেন পরিস্থিতিতে আকবরের শাসনামলের প্রথম দিকে শায়খ আহমদ সরহিন্দী জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] সেকালের সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের লোকদের

১৬. জন্ম ৯৭৫ হিজরী (১৫৬৩ খৃঃ) এবং মৃত্যু ১০৩৪ হিজরী (১৬২৪ খৃঃ)

নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁরা নিজেদের চতুষ্পার্শের বিকৃতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা না রাখলেও কমপক্ষে নিজেদের ঈমান ও আমলকে সংরক্ষিত রেখেছিলেন এবং যথাসাধ্য অন্যের সংশোধনও করতেন। বিশেষ করে হযরত শায়খ আহমদ সবচাইতে বেশী লাভবান হন হযরত বাকিবিল্লাহর সাহচর্যে। হযরত বাকিবিল্লাহ সে যুগের অন্যতম উন্নত চরিত্র সম্পন্ন বুজর্গ ছিলেন। কিন্তু হযরত শায়খের নিজের যোগ্যতাও ছিল অপরিসীম। হযরত বাকিবিল্লাহর সাথে যখন তাঁর প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় তখনই হযরত বাকিবিল্লাহ তাঁর সম্পর্কে নিজের এক বন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন ঃ

> "সম্প্রতি সরহিন্দ থেকে শায়খ আহমদ নামে এক ব্যক্তি এসেছে। বিপুল দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারী। কর্মক্ষমতাও ব্যাপক। ফকিরের সাথে কয়েকদিন তার আলোচনা হয়েছে। এ সময়ে তার যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, পরবর্তীকালে এ ব্যক্তি একটি আলোকবর্তিকার আকারে সমগ্র দুনিয়াকে উজ্জ্বল করবে।"

এ ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে সত্যে প্রমাণিত হয়। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় তৎকালে বহু সত্যানুসারী ওলামা ও সুফি বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে তিনি একাই সমকালীন ফিতনাসমূহের মোকাবিলা ও ইসলামী শরীয়তকে সাহায্য করার জন্যে অগ্রসর হন। রাজশক্তির মোকাবিলায় তিনি একাই ইসলামী পুনরুজ্জীবনের সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এ নিঃসহায় ও নিঃসম্বল ফকিরটি একাকী প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে সরকারী সাহায্য পুষ্ট গোমরাহির মোকাবিলা করেন এবং সরকারী রোষানলে পতিত শরীয়তের পক্ষ সমর্থন করেন। সরকার তাঁকে দমন করার জন্যে যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করে, এমনকি তাঁকে কারাগারেও প্রেরণ করে। কিন্তু অবশেষে তিনি ফিতনার গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। 'সম্মানের সিজদা' না করার কারণে জাহাংগীর তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু অবশেষে জাহাংগীর নিজেই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজ পুত্র খুররমকে—যিনি পরবর্তীকালে শাহজাহান উপাধি লাভ করে তখতনশীন হন—তাঁর ছাত্রের দলে ভর্তি করে দেন। ফলে ইসলামের ব্যাপারে সরকারের বিরোধ ও বিদ্বেষ সম্মানের রূপ লাভ করে। 'দীনে ইলাহি আকবর শাহ' তার দরবারী শরীয়ত প্রণেতাদের সৃষ্ট যাবতীয় বেদআতসহ বিদায় গ্রহণ করে। ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয় তা স্বভাবতই বাতিল হয়ে যায়। সরকার যদিও রাজানুগত ছিল তবুও এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা ও শরীয়তের বিধানাবলীর ব্যাপারে তার মনোভাব কাফেরসুলভ হবার পরিবর্তে

হয় ভক্তসুলভ। শায়খের মৃত্যুর তিন-চার বছর পর আলমগীরের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ শায়খের পরিব্যাপ্ত সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রভাবেই তৈমুর বংশে এ শাহজাদাটি এমন তত্ত্বগত ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন, যার ফলে আকবরের ন্যায় শরীয়ত ধ্বংসকারীর প্রপুত্র শরীয়তের খাদেমে পরিণত হন।

শায়খের কার্যাবলী শুধু এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে, ভারতের রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে পূর্ণতঃ কুফরীর দিকে চলে যাবার পথে তিনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন এবং আজ থেকে তিন-চারশো বছর আগে এখানে ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবার জন্যে যে বিরাট ফিতনার সয়লাব প্রবাহিত হয়, তার গতিধারাও পরিবর্তিত করে দেন। বরং এছাড়া আরো দুটো বিরাট কার্যও তিনি সম্পাদন করেন। এক, দার্শনিক ও বৈরাগ্যবাদী ভ্রষ্টতার কারণে তাসাউফের নির্মল ঝরণাধারায় যেসব ময়লা-আবর্জনা মিশ্রিত হয়ে যায়, তা থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ইসলামের নির্ভেজাল ও আসল তাসাউফ পেশ করেন। দুই, তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে যেসব জাহেলী রসম-রেওয়াজ বিস্তার লাভ করে তিনি তার কঠোর বিরোধিতা করেন এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শরীয়ত অনুসারিতার এক শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালনা করেন। এ আন্দোলনের হাজার হাজার সুদক্ষ কর্মী কেবল ভারতের বিভিন্ন এলাকায়ই নয় বরং মধ্য এশিয়ায়ও পৌঁছে যায় এবং সেখানকার জনগণের চরিত্র ও আকিদার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। এ কার্যাবলীর কারণেই হযরত শায়খ সরহিন্দী মুসলিম মুজাদ্দিদগণের মধ্যে স্থানলাভ করেছেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফি সানির (র) ইন্তেকালের পর এবং বাদশাহ আলমগীরের ইন্তেকালের চার বছর পূর্বে দিল্লীর শহরতলীতে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন।[১৭] এদিকে তাঁর জামানা ও পরিবেশ এবং অন্য দিকে তাঁর কার্যাবলীকে সামানাসামনি রেখে বিচার করতে অগ্রসর হলে মানুষ হতবাক হয়ে যায় যে, সে যুগের এহেন গভীর দৃষ্টি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম কেমন করে সম্ভব হলো। ফররুখ সায়র, মুহম্মদ শাহ রংগীলা ও শাহ আলমের ভারতবর্ষকে কে না জানে। সেই অন্ধকার যুগে শিক্ষালাভ করে এমন একজন মুক্ত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও ভাষ্যকার জনসমক্ষে আবির্ভূত হন যিনি জামানা ও পরিবেশের সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে চিন্তা করেন, আচ্ছন্ন ও স্থবির জ্ঞান ও শতাব্দীর জমাট বাঁধা বিদ্বেষের বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিটি জীবন সমস্যার ওপর অনুসন্ধানী ও মুজতাহিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং এমন সাহিত্য সৃষ্টি করে যান—যার ভাষা, বর্ণনাভংগী, চিন্তা, আদর্শ, গবেষণালব্ধ বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহের ওপর সমকালীন পরিবেশের কোনো ছাপ পড়েনি। এমনকি তাঁর রচনা পাঠ করার সময় মনে এতটুকু সন্দেহেরও উদয় হয় না যে, এগুলো এমন এক স্থানে বসে রচনা করা হয়েছে যার চতুর্দিকে বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, হত্যা, লুটতরাজ, যুলুম, নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃংখলার অবাধ রাজত্ব চলছিল।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মানব ইতিহাসের এমন এক বিশেষ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত যারা হামেশা মতবাদের বিভ্রান্তি মুক্ত করে চিন্তা ও গবেষণার একটি পরিচ্ছন্ন ও সরল রাজপথ তৈরী করেন এবং মানস জগতে সমকালীন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নব সৃষ্টির এমন এক চিত্তাকর্ষক নকশা তৈরী করেন যার ফলে অনিবার্যরূপে অন্যায় ও অসুন্দরের ধ্বংস সাধন এবং ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন জন্মলাভ করে। এ ধরনের নেতা কদাচিৎ নিজের চিন্তা ও মতাদর্শ অনুযায়ী নিজেই একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং বিকৃত পৃথিবীকে ভেঙেচুরে স্বহস্তে একটি নতুন পৃথিবী গঠন করার জন্যে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। এ ধরনের নেতৃবৃন্দের আসল কাজ হয় এই যে, তাঁরা সমালোচনার ছুরি চালিয়ে শত শত বছরের বিভ্রান্তজাল ছিন্ন ভিন্ন করেন, বুদ্ধি ও চিন্তাজগতে নতুন আলোক শিখার উন্মেষ ঘটান, জীবনের বিকৃত অথচ শক্তিশালী কাঠামোটি

১৭. জন্ম ১১১৪ হিজরী (১৭০৩ খৃঃ) ও মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী (১৭৬৩ খৃঃ)

ভেঙে তার ভগ্নাবশেষ থেকে আসল ও দীর্ঘস্থায়ী সত্যকে পৃথক করে দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। এ কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিরাট। তাই এ কার্য সম্পাদনকারী আবার নিজেই কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করে কার্যতঃ জাতি গঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করবেন এ অবসর তিনি কদাচিৎ লাভ করতে পারেন। যদিও শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর রচিত 'তাফহীমাতে ইলাহিয়া' গ্রন্থের একস্থানে এ সম্পর্কে কিছুটা ইংগিতও দিয়েছেন যে, স্থান-কালের উপযোগী হলে তিনি যুদ্ধ করেও কার্যতঃ সংশোধন করার যোগ্যতাও রাখতেন।[১৮] কিন্তু আসলে এ জাতীয় কোনো কাজ তিনি করেননি। সমালোচনা ও চিন্তার পুনর্গঠনের ব্যাপারেই তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত ছিল। এ বিরাট কাজ থেকে তিনি এতটুকুও অবসর পাননি। নিজের নিকটতম পরিবেশের সংশোধনের জন্যে সামান্যতম পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফুরসতও তাঁর ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা একথা আলোচনা করবো যে, তিনি যে পথ পরিষ্কার করেছিলেন, তার ভিত্তিতে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে অন্য একদল লোকের প্রয়োজন ছিল এবং মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই তারা তাঁর নিজেরই শিক্ষা ও অনুশীলনগাহের মধ্য থেকে শক্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর সংস্কারমূলক কার্যাবলীকে আমরা প্রধানতঃ দু ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এক, সমালোচনা ও সংশোধনমূলক। দুই, গঠনমূলক। এ উভয় কার্যাবলীকে আমি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করবো।

সমালোচনা ও সংশোধন

শাহ ওয়ালিউল্লাহ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র ইসলামী ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। আমার জানা মতে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রথম ব্যক্তি যাঁর দৃষ্টি ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানের সূক্ষ্ম ইতিহাসের মৌল পার্থক্য পর্যন্ত পৌঁছে, যিনি ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে মুসলিম ইতিহাসের সমালোচনা

---

১৮. তাফহীমাত, প্রথম খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা ঃ

فلو فرض ان يكون هذا الرجل فى زمان واقتضت الاسباب ان يكون اصلاح الناس بقامة الحروب ونفث فى قلبه اصلاحهم لقلم هذا الرجل بامر الحرب اتم قيام وكن اما مافى الحرب لايقاس بالرستم والاسفند ياربل الرستم ولا سفندبار وغير هما طفيليون مستمدون منه مقتدون به-

অর্থাৎ 'যদি সে যুগে যুদ্ধ করে মানুষের সংশোধন সম্ভব হতো এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও লাভ করা যেতো, তাহলে এ ব্যক্তি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) দস্তুরমতো যুদ্ধ করতো। এবং সে যুদ্ধের ব্যাপারেও অত্যন্ত পারদর্শী। মহাবীর রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের যুদ্ধ কৌশল ও শৌর্যবীর্য তার নিকট নিতান্তই তুচ্ছ।'

ও পর্যালোচনা করেন। এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম একথা অবগত হবার চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন শতকে ইসলাম গ্রহণকারী জাতিসমূহের মধ্যে আসলে ইস-লাম কি অবস্থায় থাকে। এটি বড়ই নাজুক বিষয়বস্তু। আগেও কিছু লোক এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হন এবং আজও হয়েছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর পর এমন একজন লোকও আবির্ভাব ঘটেনি যাঁর মনে মুসলিম ইতিহাস ছাড়া আসল ইসলামী ইতিহাসের কোনো পৃথক ধারণা ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহর রচনার বিভিন্ন অংশে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। বিশেষ করে 'ইযালাতুল খিফা' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠা[১৯] পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রত্যেক যুগের বিশেষত্ব এবং প্রত্যেক যুগের ফিতনা বিবৃত প্রসংগে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ইংগিতবহ নবী করীম (স)-এর ভবিষ্যত বাণীগুলোও উদ্ধৃত করেন। এ আলোচনায় মোটামুটি মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস. শিক্ষা, চরিত্র, তমুদ্দুন ও রাজনীতিতে সংমিশ্রিত সকল প্রকার জাহেলিয়াতের দিকে অংগুলি নির্দেশ করা হল।

অতপর গলদের স্তুপের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি একথা জানার চেষ্টা করেন যে, এর মধ্যে মৌলিক গলদ কোন্‌গুলো—যেখান থেকে সকল গলদের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে তিনি দুটি বিষয়ের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন। একটি হলো খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গতি পরিবর্তন এবং অন্যটি হলো ইজতিহাদের প্রাণ শক্তির মৃত্যু ও মন-মস্তিষ্কের ওপর অন্ধ অনুসারিতার বিপুল আধিপত্য।

প্রথম গলদটি সম্পর্কে তিনি 'ইযালায়' বিস্তারিত আলোচনা করেন। খেলাফত ও রাজতন্ত্রের নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে যেমন সুস্পষ্টভাবে তিনি বর্ণনা করেন এবং হাদীসের সাহায্যে যেভাবে তার ব্যাখ্যা করেন তাঁর পূর্বেকার লেখকদের রচনায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। অনুরূপভাবে এ বিপ্লবের ফলাফলকে তিনি যেমন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তীদের রচনায় তেমনটি দেখা যায় না। এক স্থানে তিনি লেখেন ঃ

> "ইসলামের আরকানসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিরাট গলদ দেখা দিয়েছে। --- হযরত উসমান (রা)-এর পর কোনো শাসক হজ্জ কায়েম করেননি বরং নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে থাকেন। অথচ হজ্জ কায়েম করা খেলাফতের অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্যতম। সিংহাসনে আরোহণ করা, শাহী তাজ পরিধান করা এবং পূর্ববর্তী বাদশাহগণের স্থানে উপবেশন

১৯. ১২৮৬ হিজরীতে বেরিলী হতে প্রকাশিত 'ইযালাতুল খিফা' গ্রন্থ হতে আমি এ আলোচনা পেশ করেছি।

করা যেমন কাইসারের জন্যে বাদশাহীর চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হতো অনুরূপভাবে নিজের কর্তৃত্বে হজ্জ প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামে খিলাফতের আলামত রূপে পরিচিত।"[২০]

আর এক স্থানে লেখেন ঃ

"পূর্বে উপদেশ ও ফতোয়া দুটিই খলিফার রায়ের ওপর নির্ভর করতো। খলিফা ছাড়া কারোর উপদেশ ও ফতোয়া প্রদান করার অধিকার ছিল না কিন্তু এ বিপ্লবের পর উপদেশ ও ফতোয়া উভয়ই এ তত্ত্বাবধান মুক্ত হয় বরং পরবর্তীকালে ফতোয়া দানের জন্যে এমনকি সৎলোকদের দলের পরামর্শেরও কোন শর্ত ছিল না।"[২১]

অতপর বলেন ঃ

"এদের সরকার অগ্নি উপাসকদের সরকারের ন্যায়। তবে পার্থক্য এতটুকুন যে, এরা নামায পড়ে এবং মুখে কালেমা শাহাদত উচ্চারণ করে। এই পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের জন্ম। জানি না পরবর্তীকালে আল্লাহ তায়ালা আরো বা কি দেখাতে চান।"[২২]

দ্বিতীয় গলদটি সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইযালাতুল খিফা, হুজ্জাতুল্লাহহিল বালিগাহ, বুদুরে বাজিগাহ, তাফহিমাত, মুসাফফা, মুসাওওয়া এবং তাঁর অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থেই দুঃখ প্রকাশ করেন।

ইযালায় বলেন ঃ

"সিরীয় শাসকদের (উমাইয়া সরকার) পতনকাল পর্যন্ত, কেউ নিজেকে হানাফী বা শাফেয়ী বলে দাবী করতো না। বরং সবাই নিজেদের ইমাম ও শিক্ষকগণের পদ্ধতিতে শরীয়তের প্রমাণ সংগ্রহ করতেন। ইরাকী শাসকদের (আব্বাসীয় সরকার) জামানায় প্রত্যেকেই নিজের জন্যে একটি নাম নির্দিষ্ট করে নেয়। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, নিজেদের মযহাবের বড় বড় নেতাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাতের দলিলের ভিত্তিতে তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না। এভাবে কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাখ্যার ফলে অনিবার্যরূপে যেসব মতবিরোধ সৃষ্টি হতো, সেগুলো স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩]

---

২০. ইযালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা।
২১. ইযালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।
২২. ইযালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
২৩. ইযালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

অতপর আরব শাসকদের পতনের পর অর্থাৎ তুর্কী শাসনামলে লোকেরা বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকেই নিজের ফিকাহ্ ভিত্তিক মযহাব থেকে যাকিছু স্মরণ করতে সক্ষম হয়, সেটুকুকেই আসল দীনে পরিণত করে। পূর্বে যে বস্তু কুরআন ও হাদীসের সূত্র উদ্ভূত মযহাব ছিল, এখন তা স্থায়ী সুন্নাতে পরিণত হয়। এখন তাদের বিদ্যা ও জ্ঞান নির্ভর করতে থাকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত বিধানাবলীর সংগ্রহ এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে খুঁটিনাটি বিষয় সংগ্রহ করার ওপর।[২৪]

মুসাফফায় লেখেন ঃ

"আমাদের জামানার নির্বোধ ব্যক্তিরা ইজতিহাদের নামে ক্ষেপে ওঠে। এদের নাকে উটের মতো দঁড়ি বাঁধা আছে। এরা জানে না, কোন্ দিকে যাচ্ছে। এদের ব্যাপারই ভিন্ন রকমের। ঐসব ব্যাপার বুঝার যোগ্যতাও এ বেচারাদের নেই।"[২৫]

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'র সপ্তম অধ্যায়ে ও 'ইনসাফে' শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) এ রোগের পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত করেন এবং এর দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় ত্রুটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন।

ঐতিহাসিক সমালোচনার পর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সমকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকের দোষ-ত্রুটি বিবৃত করেন। তাফহিমাতের একস্থানে লেখেন ঃ

"এ ওসিয়তকারী (অর্থাৎ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্) এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেছে যখন মানুষ তিনটি বিষয়কে মিশ্রিত করে ফেলেছে ঃ

১. **কুতর্ক ঃ** গ্রীক বিদ্যাসমূহের মিশ্রণের ফলে এর উদ্ভব হয়েছে। লোকেরা কালাম শাস্ত্রের বিতর্কে মশগুল হয়ে গেছে। এমন কি আকিদা-বিশ্বাসের প্রশ্নে এমন কোনো আলোচনা হয় না যার মধ্যে অনর্থক যুক্তি-ভিত্তিক বিতর্ক থাকে।

২. **অনুভূতির আনুগত্য ঃ** সুফিদের জনপ্রিয়তা ও তাদের ভক্তদলে শামিল হবার কারণে এর উদ্ভব হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র এলাকায় এ জিনিসটি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এমন কি এই সুফিদের কথা ও কর্ম সাধারণ মানুষের মনের ওপর কুরআন ও সুন্নাত তথা সকল জিনিসের চাইতে বেশী

২৪. ইযালাতুল খিফা, প্রথম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
২৫. মুসাফ্ফা, প্রথম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

আধিপত্যশালী। তাঁদের তত্ত্বকথা ও ইংগিতসমূহ এতবেশী প্রতিষ্ঠালাভ করেছে যে, যে ব্যক্তি এসব তত্ত্বকথা ও ইংগিতসমূহ অস্বীকার করে অথবা এগুলোকে আমল না দেয়, সে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না এবং সৎলোকদের মধ্যেই গণ্য হয় না। মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে সুফিদের ইশারা ইংগিত বর্জিত বক্তৃতা করে। মাদ্রাসায় অধ্যাপনারত এমন কোনো আলেমও নেই, যে তাদের কথায় বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ না করে। অন্যথায় তারা নির্বোধ বিবেচিত হয়। আবার আমির-ওমরাহদের এমন কোনো মজলিস নেই যেখানে মাধুর্য, সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও শিল্পকারিতার জন্যে সুফিদের কবিতা ও তত্ত্বকথা ব্যাপকভাবে ব্যবহার না করা হতো।

৩. **খোদার প্রতি আনুগত্য ঃ** মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে এটি মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য ছিল।

"আবার এ যুগের একটি অন্যতম রোগ হলো এই যে, প্রত্যেকে নিজের মত অনুযায়ী চলছে। এরা লাগামহীনভাবে চলছে, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কুরআন ও হাদীসের কোনো আলংকারিক বিষয়ে এসে স্তব্ধ হয়েও যায় না এবং এদের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত কোনো বিষয়ে অনুপ্রবেশ করা থেকেও বিরত হয় না। প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে খোদা ও রসূলের নির্দেশাবলীর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করছে এবং এ ব্যাপারে নিজে যা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তার ভিত্তিতে অন্যের সংগে বিতর্ক ও কুতর্কে লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও আর একটি রোগ দেখা দিয়েছে। হাম্বলী ও শাফেয়ী প্রভৃতি ফিকাহর মধ্যে তীব্র বিরোধ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজের পদ্ধতিকে একমাত্র সত্য মনে করেছে এবং অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছে। প্রত্যেক মযহাবে খুঁটিনাটি ও পুংখানুপুংখ বর্ণনার আধিক্য, আর এই সবিস্তার বর্ণনার ভিড়ে সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।"

ঐ বইয়ের আর এক স্থানে লেখেন ঃ

"কোনো ন্যায়সংগত অধিকার ছাড়াই যেসব পীরজাদা বাপ-দাদার গদীনশীন হয়েছে, তাদেরকে আমি বলি ঃ তোমরা কেন এইসব পৃথক পৃথক দল গঠন করে রেখেছো ? তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে চলছো কেন ? আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে পথটি অবতীর্ণ করেছিলেন সেটি পরিত্যাগ করেছো কেন ? তোমাদের প্রত্যেকে ইমামে পরিণত হয়েছে। মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। নিজেদেরকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েতদানকারী

মনে করছে, অথচ সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। পার্থিব স্বার্থের খাতিরে যারা মানুষের নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তাদের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট নই। আর যারা দুনিয়ার স্বার্থের খাতিরে জ্ঞান অর্জন করে অথবা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে তাদের দ্বারা নিজেদের পার্থিব কামনা চরিতার্থ করে, তাদের প্রতিও আমরা সন্তুষ্ট নই। তারা সবাই দস্যু, দাজ্জাল, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত। ----"

"নিজেদেরকে উলামা আখ্যাদানকারী তালেবে ইলমদেরকেও আমি বলি ঃ নির্বোধের দল ! তোমরা গ্রীকদের বিদ্যা, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের গোলক ধাঁধায় আটকে পড়েছো আর মনে করছো যে, বিদ্যা-বুদ্ধি এগুলোর নাম। অথচ বিদ্যা খোদার কিতাবের আয়াতে সুস্পষ্ট অথবা তাঁর রসূলের মাধ্যমে প্রমাণিত সুন্নাতের মধ্যে নিহিত। ---- তোমরা পূর্ববর্তী ফকিহগণের খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বর্ণনাবলীর মধ্যে ডুবে গিয়েছো। তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা বলেছেন, সেটিই একমাত্র হুকুম ? তোমাদের অধিকাংশ লোকের অবস্থা হলো যে, নবীর কোনো হাদীস যখন তাদের নিকট পৌছুয়, তখন তারা তার ওপর আমল করে না। তারা বলে ঃ আমরা তো অমুক মযহাবের ওপর আমল করি, হাদীসের ওপর নয়। অতপর তারা বাহানা পেশ করে যে, জনাব ! হাদীস বুঝা ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিশেষজ্ঞ ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী লোকদের কাজ, তাছাড়া এ হাদীসটি পূর্ববর্তী ইমামগণের দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল না নিশ্চয়ই। তাহলে তাদের এ হাদীসটি পরিত্যাগ করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে। জেনে রেখ ! এটি আদৌ দীনের পথ নয়। যদি তোমরা তোমাদের নবী (স)-এর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে কোনো মযহাবের বিপক্ষে বা স্বপক্ষে যাই হোক না কেন, তাঁর ইত্তেবা করো। ----"

"আমি ওয়াজ-নসিহতকারী, আবেদ ও খানকাহবাসিদেরকে বলি ঃ হে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবিদারগণ ! তোমরা যত্রতত্র ছুটে বেড়াচ্ছো এবং ভালো-মন্দ সবকিছু হস্তগত করছো। তোমরা মানুষকে মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়ের দিকে আহ্বান করছো। তোমরা খোদার বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। অথচ তোমরা সংকীর্ণতা নয়, ব্যাপকতার জন্য আদিষ্ট ছিলে। তোমরা অপ্রকৃতিস্থ খোদা প্রেমিকদের কথাকে নির্ভরশীল বলে মেনে নিয়েছো। অথচ এসব বিক্ষিপ্ত করার নয়, বেঁধে তুলে রাখবার জিনিস -----।"

"আমি আমির-ওমরাহকে বলি ঃ তোমাদের কি খোদার ভয় নেই ? তোমরা ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্যে ব্যাপক সুযোগ দান করছো। প্রকাশ্যে শরাব পান করা হচ্ছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছো না। প্রকাশ্যে ব্যভিচার, শরাব পান ও জুয়া খেলার আড্ডা চালু আছে অথচ তোমরা এইগুলো বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা করছো না। এই বিরাট দেশে সুদীর্ঘকাল থেকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তোমরা যাকে দুর্বল মনে কর, তাকে খেয়ে ফেলো আর যাকে শক্তিশালী মনে কর, তাকে ছেড়ে দাও। নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, স্ত্রীদের মান-অভিমান এবং গৃহ ও বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যেই তোমরা ডুবে গিয়েছো। একবার খোদার কথা চিন্তা করো না ----।"

"আমি সৈন্যদেরকে বলি ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে জিহাদ করার জন্যে, হকের কালেমা বুলন্দ করার জন্যে এবং শের্ক ও মুশরিকদের শক্তি নাশ করার জন্যে সৈন্যে পরিণত করেছিলেন। এ কর্তব্য উপেক্ষা করে তোমরা ঘোড়সওয়ারী অস্ত্রসজ্জা করাকেই নিজেদের পেশায় পরিণত করেছো। বর্তমানে জিহাদের নিয়ম ও উদ্দেশ্যের সংগে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থ উপার্জন করার জন্যে তোমরা সেনাবাহিনীতে চাকুরী নিয়েছো। তোমরা ভাং ও শরাব পান করো, দাড়ি মুণ্ডন করো ও গোঁফ লম্বা করো, মানুষের ওপর যুলুম নির্যাতন চালাও। তোমাদের মধ্যে হালাল-হারাম রুজির পার্থক্য ঘুচে গেছে। খোদার কসম, একদিন তোমাদেরকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে, তারপর তোমরা কি কাজ করে এসেছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবগত করাবেন ---।"

"আমি শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষকে বলি ঃ বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। নিজের প্রতিপালকের বন্দেগী থেকে তোমরা গাফেল হয়ে গিয়েছো এবং খোদার সাথে শের্কে লিপ্ত হয়েছো। তোমরা গায়রুল্লাহর জন্যে কুরবানী করো এবং মাদার সাহেব ও সালার সাহেবের কবরে গিয়ে হজ্জ সম্পাদন করো। এগুলো তোমাদের নিকৃষ্টতম কাজ। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হয়, সে নিজের খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর এতবেশী খরচ করে যে, তার আয় তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। তখন পরিবার পরিজনের অধিকার গ্রাস করে অথবা শরাব পান ও বারবনিতাদের মধ্যে নিজে ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই নষ্ট করে ----।"

"অতপর মুসলমানদের দল-উপদলকে সমষ্টিগতভাবে সম্বোধন করে বলি : হে বনি আদম! তোমরা নিজেদের চরিত্র নাশ করছো। তোমরা সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছো। শয়তান তোমাদের সংরক্ষকে পরিণত হয়েছে। তোমাদের পুরুষরা নারীদেরকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করে রেখেছে। হালাল তোমাদের মুখে বিস্বাদ ঠেকছে ---।"

"হে বনি আদম ! তোমরা এমনসব নিকৃষ্ট রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছো, যার ফলে দীন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন আশুরার দিন তোমরা একত্রিত হয়ে কুকর্মে লিপ্ত হও। একটি দল ঐ দিনটিকে মাতমের দিনে পরিণত করেছে। তোমরা কি জান না যে, সকল দিনের মালিক আল্লাহ এবং সকল দুর্ঘটনা তাঁরই ইচ্ছায় সংঘটিত হয় ? হযরত হুসাইন (রা)-কে যদি ঐ দিন শহীদ করা হয়ে থাকে, তাহলে এমন কোন্ দিন আছে, যেদিন খোদার কোনো প্রিয়তম বান্দার মৃত্যু সংঘটিত হয়নি ? কিছু লোক ঐ দিনটিকে খেলার দিনে পরিণত করেছে। অতপর শবেবরাতের দিন তোমরা মূর্খ জাতিদের ন্যায় খেলা-ধূলায় মত্ত হও। তোমাদের একটি দল মনে করে যে, ঐ দিন মুর্দাদের নিকট বেশী করে খাদ্য পাঠানো উচিত। যদি তোমাদের এ ধারণার পেছনে কোনো সত্যতা থাকে, তাহলে এ ধারণা ও কার্যের সমর্থনে কোনো দলিল পেশ করো। আবার তোমরা এমনসব রসমও বানিয়ে রেখেছো যার ফলে তোমাদের জীবনধারা সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। যেমন বিবাহে অমিতব্যয়িতা, তালাককে নিষিদ্ধ কর্মে পরিণত করা, বিধবা মেয়েদেরকে অবিবাহিত বসিয়ে রাখা। এ ধরনের রসম-রেওয়াজের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবন ও সম্পদ নষ্ট করছো। তোমরা সত্য ও সুন্দর হেদায়েতকে পরিত্যাগ করেছো। অথচ এ রসম-রেওয়াজসমূহ বর্জন করে তোমাদেরকে এমন পথে চলা উচিত ছিল যে পথ কঠিন নয় বরং সহজ। তোমরা মৃত্যু ও দুঃখকে ঈদে পরিণত করেছো। মনে হয় যেন তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে যে, কারোর মৃত্যু হলে তার আত্মীয়স্বজনকে বিরাট ভোজসভা অনুষ্ঠান করতে হবে। তোমরা নামায থেকে গাফেল হয়ে গেছো। অনেকে নিজের কাজ-কারবারে এতবেশী ব্যস্ত থাকে যে, নামায পড়ার সময় পায় না। অনেকে বিলাসিতা ও খোশগল্পের মধ্যে এতবেশী মশগুল থাকে যে, নামাযের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। তোমরা যাকাত থেকে গাফেল হয়ে গেছো। তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ধনী নেই, যে বাইরের বহুলোকের খাওয়ার দায়িত্ব নেয়নি। তারা ঐ সমস্ত লোকের খাওয়া-পরার দায়িত্ব পালন করে কিন্তু কখনো যাকাত ও ইবাদতের নিয়ত করে না। তোমরা রমযানের রোযাও

নষ্ট করো। এজন্যে নানান ওজর পেশ করে থাকো। তোমরা নিতান্ত অকর্মণ্য ও অবিবেচক হয়ে পড়েছো। তোমাদের ভরণ-পোষণ বাদশাহ্ প্রদত্ত অজীফা ও পদমর্যাদার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যখন তোমাদের বোঝা বহন করার জন্যে বাদশাহদের ভাণ্ডার অপারগ হয়, তখন তারা প্রজাদের ওপর নাহক যুলুম নির্যাতন চালাতে শুরু করে --- ।[২৬]

তাফহীমাতের আর এক স্থানে বলেন ঃ

"যারা মনষ্কামনা পূর্ণ করার জন্যে আজমীর অথবা সালারে মাসউদের কবরে বা এই ধরনের অন্যান্য স্থানে যায়, তারা এতবড় গোনাহ্ করে যে, হত্যা ও জিনার গোনাহ্ তার তুলনায় কিছুই নয়। এর মধ্যে আর নিজের মনগড়া মাবুদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ? যারা 'লাত' ও 'উজ্জা'-এর নিকট প্রার্থনা করতো তাদের কাজ এদের কাজ থেকে কোন্ দিক দিয়ে পৃথক ? হাঁ, অবশ্যি এতটুকুন পার্থক্য আছে যে, তাদের তুলনায় এদেরকে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাফের বলতে দ্বিধা করি। কেননা এদের এ বিশেষ ব্যাপারে নবী করীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মৃতকে জীবিত গণ্য করে তার নিকট মনষ্কামনা পূর্ণ করার জন্যে প্রার্থনা করে, নীতিগতভাবে তার দিল গোনাহে লিপ্ত হয়।[২৭]

এ উদ্ধৃতি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেলো। কিন্তু তবুও তাফহীমাত দ্বিতীয় খণ্ডের আরো কতিপয় উদ্ধৃতি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা নেহায়েত জরুরী মনে করি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন ঃ

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "নবী করীম (স) বলেন যে, তোমরাও অবশেষে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের পদ্ধতি অবলম্বন করবে। তারা যেখানে যেখানে পা রেখেছিল তোমরাও ঠিক সেখানে পা রাখবে। এমন কি তারা যদি কোনো গোসাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে তোমরাও সেখানে হাত ঢুকাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে খোদার রসূল ! পূর্ববর্তী উম্মতগণ বলতে কি আপনি ইহুদী ও ঈসায়ীদের দিকে ইংগিত করেছেন ? নবী করীম (স) বলেন, তারা ছাড়া আর কারা হতে পারে ?" এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন।

"খোদার রসূল (স) ঠিকই বলেছেন। আমরা এ চর্মচক্ষে সেসব দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি, যারা সৎলোকদেরকে খোদার পরিবর্তে মাবুদে পরিণত করেছে এবং ইহুদী ও ঈসায়ীদের ন্যায়

২৬. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৪-২১৯)

২৭. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

নিজেদের অলি-আওলিয়ার কবরসমূহকে সিজদা করছে। আমরা এমন লোকও দেখেছি, যারা নবী করীম (স)-এর বাণী বিকৃত করে একথা তাঁরই মুখ নিঃসৃত বলে দাবী করেন যে—'নেক লোকেরা খোদার জন্যে এবং গোনাহগার লোকেরা আমার জন্যে।' এটি ঠিক ইহুদীদের لن تمسنا النار الا اياما معدودة (আমাদেরকে কখনো দোযখে প্রবেশ করানো হবে না, আর হলেও মাত্র কয়েকদিনের জন্য) কথাটির মতো। সত্যি বলতে কি আজকাল প্রত্যেক দলের মধ্যে দীনকে বিকৃত করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করেছে। সুফিদের অবস্থা দেখো, তাঁদের মধ্যে এমনসব কথার অবাধ প্রচলন দেখা যাচ্ছে, যা কুরআন ও সুন্নার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, বিশেষ করে তৌহিদের প্রশ্নে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁরা শরীয়তের কোনো পারোয়া করেন না। ফকিহদের ফিকাহকে দেখো, তার মধ্যে এমন সব কথা আছে যার উৎসের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। যেমন দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট স্থানের পানির বিষয়[২৮] এবং কূপের পানি পাক করার বিষয়টি।[২৯] এছাড়া যুক্তিশাস্ত্রবিদ, কবি, বিত্তশালী ও জনগণের বিকৃতির তো কূল-কিনারা নেই।"[৩০]

এ উদ্ধৃতিগুলো থেকে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা যেতে পারে যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ কত বিস্তারিতভাবে মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান পর্যালোচনা করেছিলেন এবং কত ব্যাপকভাবে এর সমালোচনা করেছিলেন।

এ ধরনের সমালোচনার অপিরহার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, সমাজে যত সৎলোক থাকে, যাদের বিবেক ও ঈমানে জীবন প্রবাহ এবং অন্তরে ভালো-মন্দের পার্থক্য বিরাজিত থাকে, পরিস্থিতির অবনতির অনুভূতি তাদেরকে এবং তাদের চিত্তকে অস্থির করে তোলে। তাদের ইসলামী অনুভূতি তীব্রতর হয় এবং নিজেদের চতুষ্পার্শের জীবনধারায় জাহেলিয়াতের প্রত্যেকটি চিহ্ন তাদের চোখে কাঁটার মত বিঁধে। তাদের পার্থক্য ক্ষমতা এত বেড়ে যায় যে, জীবনের প্রত্যেক অংশে তারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মিশ্রণ বিশ্লেষণ করতে তৎপর হয়। তাদের ঈমানী শক্তি এমনভাবে জেগে ওঠে যে, জাহেলিয়াতের কাঁটাবনের প্রত্যেকটি কাঁটা তাদেরকে সংস্কার ও সংশোধনের জন্যে অস্থির করে তোলে। অতপর পুনর্গঠনের একটি সুস্পষ্ট নকশা তাদের সম্মুখে পেশ করা মুজাদ্দিদের জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে করে বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে যে নতুন রূপ দান করতে হবে তার ওপর তারা নিজেদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতে

২৮. অর্থাৎ হাউজ দশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া না হলে তার পানি 'মায়ে কাসীর' বা বেশি পানি বলে গণ্য হবে না।

২৯. অর্থাৎ কোন্ প্রাণী কূয়ায় পড়লে কত বালতি পানি বের করে দিতে হবে।

৩০. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫)

এবং নিজেদের সকল কার্য ও প্রচেষ্টাকে সেই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত করতে পারে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইতিপূর্বে সমালোচনার কাজটি যেমন ব্যাপক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছিলেন এই গঠনমূলক কাজটিও অনুরূপভাবে সম্পাদন করেন।

গঠনমূলক কাজ

গঠনমূলক ব্যাপারে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই যে, তিনি ফিকাহশাস্ত্রে একটি যুক্তিপূর্ণ মধ্যমপন্থা পেশ করেন। এতে একটি বিশেষ মযহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অন্য একটি মযহাবের সমালোচনা করা হয়নি। একজন গভীর অনুসন্ধানকারীর ন্যায় তিনি সকল ফিকাহভিত্তিক মযহাবের নীতি-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধীনভাবে রায় কায়েম করেন। কোনো মযহাবের কোনো বিষয়ের স্বপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ লাভ করার কারণেই তিনি তার প্রতি সমর্থন জানান—সেই মযহাবের সাফাই গাইবার জন্যে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে তিনি তার প্রতি সমর্থন জানাননি। আবার কোনো মযহাবের কোনো কোনো বিষয়ের বিরোধিতা এজন্যে করেছেন যে, যুক্তি ও প্রমাণ তার বিরুদ্ধে পেয়েছেন—এজন্যে নয় যে, ঐ মযহাবের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোনো প্রকার বিদ্বেষ আছে। এ কারণেই কোথাও তাঁকে হানাফী, কোথাও শাফেয়ী, কোথাও মালিকী আবার কোথাও হাম্বলী রূপে দেখা যায়। যেসব লোক একটি বিশেষ মযহাবের জোয়াল কাঁধে করে নিয়েছে এবং সকল বিষয়ে তারই আনুগত্য করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছে, তিনি তাদেরও বিরোধিতা করেন। অনুরূপ-ভাবে তাদেরও বিরোধিতা করেন, যারা বিভিন্ন মযহাবের ইমামগণের মধ্যে কোনো বিশেষ একজনের বিরোধিতা করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছে। এ উভয় পথের মাঝামাঝি তিনি একটি ভারসাম্যমূলক পথে অগ্রসর হন, যার ওপর প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হতে পারে। তাঁর 'ইনসাফ' বইয়ে তাঁর এ পদ্ধতির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'মুসাফ্ফা' এবং অন্যান্য বইতেও এই মতবাদের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

তাফহীমাতের এক স্থানে লেখেন ঃ

"আমার মনে একটি চিন্তার উদগম হয়েছে যে, আবু হানিফা ও শাফেয়ীর মযহাব মুসলিম উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত। এ দু'জনের মযহাবকে সর্বাধিক সংখ্যক লোক অনুসরণ করে এবং বইপত্রও এদেরই সবচাইতে বেশী। ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুতাকাল্লিম ও সুফিদের অধিকাংশই শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী। অন্যদিকে সরকার ও জনসাধারণের বেশীর ভাগ হানাফী মযহাবের অনুসারী। বর্তমানে আসমানীতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল সত্য বিষয়টি হলো ঃ এই দুটি মযহাবকে একটি মযহাবের

রূপ দান করা, উভয় মযহাবের বিষয়াবলীকে নবী করীম (স)-এর হাদীসের মাধ্যমে যাঁচাই করা। যাকিছু হাদীসের অনুসারী হবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং যার কোনো উৎস না পাওয়া যায়, তাকে বাতিল করা। অতপর যাঁচাই-বাছাইর পর যে মতগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেগুলো সম্পর্কে যদি উভয় মযহাবই ঐক্যমতে পৌঁছে তাহলে সেগুলোকে অবশ্যি দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা উচিত আর যদি সেগুলোর ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে উভয়ের মতই স্বীকার করে নেয়া উচিত এবং এ উভয় মত কার্যকরী করাকে নির্ভুল গণ্য করা উচিত। সেগুলো সম্পর্কে মতবিরোধ কুরআনে কেরাতের বিভিন্নতার সমপর্যায়ভুক্ত হবে অথবা রুখসাত ও আযীমাতের[৩১] মধ্যকার পার্থক্যের সমপর্যায়ভুক্ত হবে অথবা এ পার্থক্য হবে কোনো জটিল বিষয় থেকে বের হবার দুটি পথের পার্থক্যের ন্যায়। যেমন একাধিক কাফ্ফারা[৩২] অথবা দুটি সমান মোবাহ্ পদ্ধতির অবস্থার ন্যায় হবে। ইনশাআল্লাহ এ চারটি দিক ছাড়া পঞ্চম দিকের কোন সম্ভাবনা নেই।[৩৩]

'ইনসাফ'-এ তিনি এর চাইতেও বিস্তারিতভাবে নিজের রায় পেশ করেছেন। বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন তা এমন পর্যায়ের যে, আহলে হাদীস (সরাসরি হাদীসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধানকারী) ও আহলে তাখরীজ (ইমামগণের ইজতিহাদের অনুসারী) উভয়কেই সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-বিশ্লেষণ করা উচিত। এ আলোচনায় তিনি যে পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাহলো আহলে হাদীস ও আহলে তাখরীজ উভয় পদ্ধতিকে অবহিত করা। অনুরূপভাবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার সপ্তম অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত যে আলোচনা করেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য।

এ মধ্যমপন্থা গ্রহণ করার ফলে বিদ্বেষ, সংকীর্ণমনতা, অন্ধ অনুসৃতি ও অনর্থক দীর্ঘ আলোচনায় সময় নষ্ট করার অবসান ঘটে এবং ব্যাপক দৃষ্টি-ভংগীসহ অনুসন্ধান ও ইজতিহাদের পথ উন্মুক্ত হয়। এজন্যেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ

---

৩১. কোনো কাজ না করার ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক সুবিধা প্রদানকে রুখসত এবং শরীয়ত কর্তৃক সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঐ কাজ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়াকে আযীমাত বলা হয়।–অনুবাদক

৩২. যেমন ইচ্ছা করে কোনো রোযা ভাঙলে তার কাফ্ফরা আদায়ের নিয়ম হলো এই যে, পরপর ৬০টি রোযা রাখতে হবে অথবা ৬০জন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। দুটির যে কোনো একটি গ্রহণ করলেই চলবে।

৩৩. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–২১১-২১২।

এ সঙ্গে ইজতিহাদের প্রয়োজনের ওপরও জোর দেন। এবং তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি বইতে বিভিন্ন আলোচনায় বিভিন্নভাবে ইজতিহাদ ও অনুসন্ধান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুসাফ্ফার ভূমিকা থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃতি করছি ঃ

"ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরযে কেফায়া। এখানে ইজতিহাদ অর্থ হলো শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন এবং তাদের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের আইন-কানুনকে যথাযথ-ভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, তা কোনো বিশেষ মযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে। আর ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরয হবার যে কথা বলেছি, তা এজন্যে যে, প্রতি যুগে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্পর্কে খোদার নির্দেশ জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছে, তা এ ব্যাপারে যথেষ্ট হয় না বরং তার মধ্যে নানান মতবিরোধও থাকে। শরীয়তের মৌল বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে এ মতবিরোধ দূর হওয়া সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণ যে পদ্ধতি নির্ণয় করেছিলেন তাও মাঝপথে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ইজহিতাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই।"[৩৪]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ শুধু ইজতিহাদের ওপর জোরই দেননি বরং তিনি বিস্তারিতভাবেই ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি, সংবিধান ও শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন। ইযালাতুল খিফা, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আকদুল জীদ, ইনসাফ বুদুরে বাজিগাহ, মুসাফ্ফা প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও তার নিছক ইংগিত আবার কোথাও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উপরন্তু তাঁর লিখিত বই-পুস্তকে যেখানেই তিনি কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, একজন সত্যানুসন্ধানী ও মুজতাহিদের ন্যায় তা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে মানুষ শুধু ইজতিহাদের নীতি-নিয়মই জানতে পারবে না বরং এই সংগে এ বিষয়ে শিক্ষলাভও করতে পারবে।

উল্লেখিত কাজ দুটি শাহ ওয়ালিউল্লাহর পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছেন। কিন্তু যে কাজ তাঁর পূর্বে আর কেউ করেনি, তাহলো এই যে, তিনি ইসলামের সমগ্র চিন্তা, নৈতিক, তমুদ্দুনিক ও শরীয়ত ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। এ কাজের ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীগণের থেকে অনেক অগ্রবর্তী হয়েছেন। যদিও প্রথম তিন চার শতকে অনেক বেশী ইমামের আবির্ভাব হয়েছে। এবং তাঁদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার দেখা

৩৪. মুসাফ্ফা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–১১।

যাবে যে, তাঁদের চিন্তা রাজ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র ছিল এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলোয়ও এমন অনেক অনুসন্ধানকারীর সাক্ষাত পাওয়া যায়, যাঁদের সম্পর্কে ধারণা করা যায় না যে, তাঁদের চিন্তারাজ্যে এ চিত্র শূন্য ছিল ; তবুও তাঁদের একজন সুনিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যবস্থাকে একটি ব্যবস্থা হিসাবে লিপিবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেননি। এ সম্মান শাহ ওয়ালিউল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়েছিল যে, তিনিই হবেন এ পথের পথিকৃত। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই হুজ্জাতুল্লাহ ও বুদুরুল বাজিগাহ গ্রন্থদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থে এ আলোচনা অধিকতর বিস্তারিত এবং শেষোক্ত গ্রন্থে প্রায়শঃই দার্শনিক দৃষ্টিভংগী সমন্বিত।

এ পুস্তকসমূহে তিনি অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলী থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। ইতিহাসে এ প্রথমবার আমরা এক ব্যক্তিকে ইসলামী দর্শন লিপিবদ্ধ করণের ভিত্তিস্থাপন করতে দেখি। এর আগে মুসলমানরা দর্শন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন ও লিখেছেন, লোকেরা নিছক অজ্ঞতাবশতঃ তাকে "ইসলামী দর্শন" নামে আখ্যায়িত করেছে। অথচ তা ইসলামী দর্শন নয়, মুসলিম দর্শন। তার বংশসূত্র গ্রীস, রোম, ইরান ও হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কিত। আসলে যে বস্তুটি এ নামে আখ্যায়িত করার যোগ্য দিল্লীর এ শায়খই সর্বপ্রথম তার ভিত্তিস্থাপন করেন। যদিও পরিভাষার ক্ষেত্রে পুরাতন দর্শন ও কালাম শাস্ত্র অথবা দর্শন ভিত্তিক তাসাউফের শব্দ সম্ভারের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং অচেতনভাবে সেখানকার বহু চিন্তা ও ধারণা গ্রহণ করেছেন যেমন, প্রথম প্রথম প্রত্যেক নতুন পথ আবিষ্কারকের জন্যে স্বভাবতই অপরিহার্য হয়ে পড়ে—তবুও গবেষণা অনুসন্ধানের নয়া দারোদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট প্রচেষ্টা। বিশেষ করে এমন চরম অবনতির যুগে এতবড় শক্তিশালী যুক্তিধর্মী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

এ দর্শনে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বিশ্বজাহান ও বিশ্বজাহানের মধ্যে মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, যা ইসলামের নৈতিক ও তমুদ্দুনিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল ও তার সমভাবাপন্ন প্রকৃতির অধিকারী হতে পারে। অথবা অন্য কথায় তাকে যদি ইসলাম বৃক্ষের কাণ্ড গণ্য করা হয়, তাহলে সেই কাণ্ড এবং তা থেকে যে বৃক্ষের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে বস্তুতঃ কোনো স্বাভাবিক পার্থক্য অনুভূত হতে পারে না।[৩৫] আমি আশ্চর্য হই যখন

৩৫. মুসলমানদের মধ্যে যে দর্শনের প্রচলন ছিল ইসলামের বাস্তব নৈতিক ও আকিদাগত ব্যবস্থার সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এজন্যে তার প্রচলন যতবেশী বৃদ্ধি হয়েছে মুসলমানদের জীবনে ততবেশী বিকৃত হয়েছে। বিশ্বাস দুর্বল হবার সাথে সাথে চরিত্রও দুর্বল হয়েছে এবং সংগে সংগে কর্মশক্তিও শিথিল হয়েছে। পরস্পর বিরোধী চিন্তার দ্বন্দ্বের এটি স্বাভাবিক ফল। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের প্রচলনেও এই একই ফলের প্রকাশ ঘটেছে। কেননা পাশ্চাত্য দর্শনও কোনোক্রমে ইসলামী ব্যবস্থার চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তরে পরিণত হতে পারে না।

কোনো কোনো ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনি যে, "শাহ ওয়ালিউল্লাহ বেদান্ত দর্শন ও ইসলামী দর্শনের সূত্র মিলিয়ে নয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্যে চিন্তার বুনিয়াদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন।" তাঁর গ্রন্থসমূহে এ প্রচেষ্টার কোনো সন্ধানই আমি পাইনি। আর যদি সত্যিই এর কোনো সন্ধান পেতাম, তাহলে খোদার শপথ শাহ সাহেবের নাম মুজাদ্দিদগণের তালিকা থেকে কেটে বাদ দিয়ে আমি তাঁকে মুজাজাদ্দিদগণের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতাম।

নৈতিক ব্যবস্থার ওপর তিনি একটি সমাজ দর্শনের ইমারত নির্মাণ করেন। 'ইরতিফাকাত' (মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলী) শিরোনামায় তিনি এর বর্ণনা শুরু করেন। এ প্রসংগে পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক আদব-কায়দা, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং এই সংগে সমাজ সভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতি সৃষ্টির কারণসমূহের ওপর আলোকপাত করেন।

অতপর তিনি শরীয়ত, ইবাদাত, আহকাম ও আইন-কানুনের পূর্ণাংগ ব্যবস্থা পেশ করেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের গূঢ় তত্ত্ব বুঝাতে থাকেন। ইমাম গাজ্জালী (র) তাঁর পূর্বে যে কাজ করেছিলেন এ বিশেষ বস্তুর ওপর তাঁর কাজ সেই একই পর্যায়ের। আর স্বাভাবিকভাবেই এ পথে তিনি ইমাম গাজ্জালী থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছেন।

শেষের দিকে তিনি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও আইন-কানুনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কমপক্ষে আমার জানামতে, তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের একটি আবছা ধারণা পেশ করেন।

ফলাফল

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এহেন যুক্তিগ্রাহ্য ও সুসংরোচিত খসড়া পেশ হবার অর্থই হলো এই যে, তা সকল সুস্থ প্রকৃতির ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হবে আর তাদের মধ্যে যারা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী তারা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে দেবে। এ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর ব্যক্তি নিজে কার্যতঃ এমন কোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করুক বা না করুক, তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না। কিন্তু যে বস্তুটি এর চাইতেও বেশী আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রমাণিত হয়, তাহলো এই যে, শাহ সাহেব জাহেলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্টরূপে জনসমক্ষে পেশ করেন এবং কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে ক্ষান্ত থাকেননি বরং এ বিষয়টিকে বারবার এমন পদ্ধতিতে পেশ করেন যার ফলে ঈমানদারদের পক্ষে জাহেলী রাষ্ট্র খতম করে সে স্থলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত

করার জন্যে প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার মধ্যে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর ইজালা যেন কেবল এ বিষয়টির ওপরই লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এ বইটিতে তিনি হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী খিলাফত ও রাজতন্ত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অতপর একদিকে রাজতন্ত্র এবং সেসব বিপর্যয়কে স্থাপন করে যেগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজতন্ত্রের পথে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী এবং সেসব অবদান পেশ করেন যা ইসলামী খিলাফত আমলে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়। এরপরও মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্তে বসে থাকা কেমন করে সম্ভব হতে পারতো?

সাইয়েদ আহমদ বেরিলভী (র) ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (র)

এ কারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর পর অর্ধশতক অতিক্রম হবার আগেই ভারতবর্ষে একটি আন্দোলনের উদ্ভব হলো। শাহ ওয়ালিউল্লাহ জনগণের দৃষ্টি সমক্ষে যে লক্ষ্যবিন্দুকে উজ্জ্বল করে গিয়েছিলেন এ আন্দোলন ছিল সেই একই লক্ষ্যের অনুসারী। সাইয়েদ সাহেবের পত্রাবলী ও বাণী এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের 'মানসাবে ইমামত', 'উকবাত', 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ও অন্যান্য রচনাবলী পাঠ করলে উভয় স্থানেই শাহ ওয়ালিউল্লাহরই সরব কণ্ঠ শ্রুত হবে। শাহ সাহেব কার্যতঃ যা করেছিলেন, তাহলো এই যে, তিনি হাদীস ও কুরআনের শিক্ষা এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সৎ ও চিন্তাসম্পন্ন লোকদের একটি বিরাট দল সৃষ্টি করেন। অতপর তাঁর চার পুত্র বিশেষ করে শাহ আবদুল আজীজ (র) বিপুলভাবে এ দলটির কলেবর বৃদ্ধি করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার ব্যক্তি ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তার ধারক, তাঁদের হৃদয়পটে ইসলামের নির্ভুল চিত্র অংকিত ছিল। তাঁরা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও উন্নত চরিত্রের কারণে সাধারণ লোকের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর শাগরিদগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে পরিণত হন। এ জিনিসটি পরোক্ষভাবে সেই আন্দোলনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যেটি শাহ সাহেবের ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে বরং তাঁর গৃহ থেকে জন্মলাভ করার প্রতীক্ষায় ছিল।

সাইয়েদ আহমদ বেরিলভী (র) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) উভয়ই আত্মিক ও চিন্তাগত দিক থেকে একই অস্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর এই একক অস্তিত্বকে আমি স্বতন্ত্র মুজাদ্দিদ মনে করি না বরং শাহ ওয়ালিউল্লাহর তাজদীদের পরিশিষ্ট মনে করি। তাঁদের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ

১. তাঁরা সাধারণ মানুষের ধর্ম, চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেসব স্থানে তাঁদের প্রভাব পৌঁছে সেখানে জীবন ধারার এমন বিপুল বিপ্লব সাধিত হয় যে, মানুষের চোখে সাহাবাদের জামানার চিত্র ভেসে উঠে।

সাইয়েদ আহমদ ১২০১ হিজরীতে (১৭৮৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ হিজরীতে (১৮৩১ খৃঃ) শাহাদাত বরণ করেন। শাহ ইসমাঈল শহীদ ১১৯৩ হিজরীতে (১৭৭৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ হিজরীতে (১৮৩১ খৃঃ) শাহাদাত লাভ করেন। সম্ভবতঃ ১৮১০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে সাইয়েদ আহমদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়।

২. উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের ন্যায় একটি পতনোন্মুখ দেশে তাঁরা যেভাবে ব্যাপকহারে জিহাদের প্রস্তুতি করেন এবং এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেভাবে নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পূর্ণতা প্রকাশ করেন, তা এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। অতপর একান্ত দূরদর্শিতার সাথে তাঁরা কার্যারম্ভের জন্যে উত্তর-পশ্চিম ভারত বর্ষকে নির্বাচিত করেন। বলা বাহুল্য, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটিই ছিল এ কাজের উপযোগী স্থান। অতপর এ জিহাদে তাঁরা এমন চরিত্রনীতি ও যুদ্ধ আইন ব্যবহার করেন যে, তার মাধ্যমে একজন দুনিয়াদার স্বার্থবাদী যোদ্ধার মোকাবিলায় একজন খোদার পথে জিহাদকারী বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এভাবে তাঁরা দুনিয়ার সম্মুখে আর একবার সঠিক ইসলামী আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁদের যুদ্ধ দেশ, জাতি বা দুনিয়ার স্বার্থকেন্দ্রীক ছিল না। বরং একান্তভাবে খোদার পথে ছিল। খোদার সৃষ্টিকে জাহেলিয়াতের শাসনমুক্ত করে তাদের ওপর স্রষ্টা ও বিশ্বজাহানের মালিকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তাঁদের দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিয়মানুযায়ী প্রথমে তাঁরা ইসলাম অথবা জিজিয়ার দিকে আহ্বান করেন। অতপর নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হবার পর তাঁরা অস্ত্রধারণ করতেন। আর অস্ত্রধারণ করার পর ইসলামের মার্জিত ও উন্নত যুদ্ধ আইনের পুরোপুরি আনুগত্য করতেন। কোনো নির্যাতনমূলক ও হিংস্রকার্য তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। তাঁরা যে লোকালয়ে প্রবেশ করেন, সংস্কারক হিসাবেই প্রবেশ করেন। তাঁদের সেনাদলের সংগে শরাব থাকতো না, ব্যাণ্ড বাজতো না, পতিতাদের পল্টন তাঁদের সংগে থাকতো না, তাঁদের সেনানিবাসে ব্যভিচারীদের আড্ডাখানায় পরিণত হতো না এবং এমন কোনো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি যে, তাঁদের সেনাদল কোনো স্থান অতিক্রম করেছে আর সেখানকার মহিলারা তাদের সতীত্ব হারিয়ে মাতম করতে বসেছে। তাঁদের সিপাহীরা দিনের বেলায় ঘোড়ার পিঠে আর রাতে জায়নামাযের ওপর থাকতেন। তাঁরা খোদার ভয়ে ভীত থাকতেন, আখেরাতের হিসাব ও জবাবদিহিকে হামেশা সম্মুখে রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো প্রকার লাভ-ক্ষতির পরোয়া করতেন না। তাঁরা কোথাও পরাজিত হলে কাপুরুষ প্রমাণিত হননি। আবার কোথাও বিজয় লাভ করে নিষ্ঠুর ও অহংকারী প্রমাণিত হননি। তাঁদের আগে ও পরে এ ধরনের নির্ভেজাল ইসলামী জিহাদ আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

৩. তাঁরা একটি ক্ষুদ্রতম এলাকায় স্বল্পকালীন রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় তাঁরা যথার্থ খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত (নবুয়াতের পন্থানুসারী খেলাফত)-এর পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ফকীরী শাসন, সাম্য, পরামর্শ সভা, ন্যায় বিচার, ইনসাফ, শরীয়তের আইন, হক অনুযায়ী অর্থ

গ্রহণ করা এবং হক অনুযায়ী খরচ করা, দুর্বল হলেও মজলুমের সাহায্য করা, শক্তিশালী হলেও যালেমের বিরোধিতা করা, খোদাভীরুতার সাথে দেশ শাসন করা এবং সততার ভিত্তিতে রাজনীতি পরিচালনা করা ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই তাঁরা সেই ইসলামী খেলাফতের পূর্ণাংগ নমুনা পেশ করেন। সিদ্দিক (রা) ও ফারুক (রা)-এর আমলের খেলাফতের চিত্রকে তাঁরা পুনরুজ্জীবিত করেন।

কতিপয় জাগতিক কারণে তাঁরা ব্যর্থ হন। এ কারণগুলো আমি পরে বর্ণনা করছি।[৩৬] কিন্তু চিন্তাজগতে তাঁরা যে আলোড়ন সৃষ্টি করে যান তার প্রভাব এক শতাব্দীর অধিক সময় অতিক্রান্ত হবার পর আজও হিন্দুস্তানে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

ব্যর্থতার কারণ

এ সর্বশেষ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ পর্যালোচনা করা সাধারণত তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ যাঁরা নিছক ভক্তি সহকারেই মহা মনীষীদের কথা আলোচনা করার পক্ষপাতী। এজন্যে আমার আশংকা হচ্ছে যে, উপরোক্ত শিরোনামায় আমি যা কিছু পেশ করবো, তা আমার অনেক ভাইয়ের মনোবেদনার কারণ হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী মনীষীগণের উদ্দেশ্যে নিছক প্রশংসাবাণী বিতরণ করাই যদি আমাদের এ সমগ্র আলোচনার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে বরং আগামীতে দ্বীনের সংস্কারের কাজে তাঁদের কার্যাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে সমালোচকের দৃষ্টিতে ইতিহাস পর্যালোচনা করা এবং এ মনীষীদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁদের ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) এবং তাঁর পুত্রগণ হক পরস্ত আলেম ও সৎলোকদের যে মহান দল সৃষ্টি করেন অতপর সাইয়েদ আহমদ বেরিলভী (র) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) সৎ ও খোদাভীরু লোকদের যে বাহিনী গঠন করেন, তার বিবরণ পড়ে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। মনে হয়, বুঝি আমরা ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবা ও তাবেঈনের জীবন চরিত পাঠ করছি। আমরা অবাক হয়ে ভাবি যে, আমাদের এতো নিকটতর যুগে এমন অদ্ভূত উন্নত চরিত্রের লোকদের আগমন হয়েছিল ! কিন্তু এই সংগে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, এতো বড় সংস্কার ও বৈপ্লবিক আন্দোলন, যার

---

৩৬. ব্যর্থতা অর্থে–সত্যিকার নয়, আপাততঃ দৃষ্টিতে যে ব্যর্থতা ধরা পড়ে। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানোই মুসলমানদের সত্যিকার সাফল্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা অবশ্যি সফলকাম হয়েছিলেন। তবে তাঁদের ব্যর্থতা পার্থিব ফলাফলের দিক দিয়ে পরিস্ফুট। কার্যতঃ তাঁরা জাহেলিয়াতের কর্তৃত্ব নির্মূল করে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আমরা এরই কারণ সমূহ পর্যালোচনা করবো। যাতে করে পরবর্তীকালে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ঐ কারণসমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সম্ভব হয়।

নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ এমন সৎ, খোদাভীরু ও অক্লান্ত মুজাহিদ ছিলেন, তাঁরা চরম প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও হিন্দুস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি কেন ? অথচ এর বিপরীত পক্ষে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আগত ইংরেজ এখানে নির্ভেজাল জাহেলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভক্তির উচ্ছ্বাসে অন্ধ হয়ে এ প্রশ্নটির জবাবদানে বিরত থাকার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, লোকেরা সত্য, সততা, খোদাভীরুতা ও জিহাদকে খোদার দুনিয়ায় সংশোধনের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রভাবের অধিকারী মনে করতে থাকবে। এ চিন্তা তাদেরকে নিরাশ করবে যে, এতোবড় সৎ ও খোদাভীরু লোকদের প্রচেষ্টায় যখন কিছু হলো না তখন ভবিষ্যতেও আর কিছু হবে না। এ ধরনের সন্দেহ আমি লোকদের মুখে শুনেছি। বরং হালে যখন আমি আলিগড়ে যাই, তখন ষ্ট্রেচী হলের বিরাট সমাবেশে আমার সম্মুখে এই সন্দেহই পেশ করা হয়। এ সন্দেহ অপনোদন করার জন্যে আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে হয়। উপরন্তু আমি এও জানি যে অধুনা উলামা ও সৎলোকদের যে বিরাট দল আমাদের মধ্যে আছেন, তাদেরও বেশীর ভাগ এ ব্যাপারে একেবারেই চিন্তাশূন্য। অথচ এ সম্পর্কে, অনুসন্ধান চালানো হলে এমনসব শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি, যার আলোকে আগামীতে আরো বেহতের ও অধিকতর নির্ভুল কার্য সম্পাদিত হতে পারে।

প্রথম কারণ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফিসানির যুগ থেকে নিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে বাধে, তাহলো এই যে,—তাঁরা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি এবং অজানিতভাবে তাদেরকে পুনর্বার সেই খাদ্য দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্ণরূপে দূরে রাখার প্রয়োজন ছিল। তাঁরা যে তাসাউফ পেশ করেন তার মূল কাঠামোর বিরুদ্ধে আমার কোনো আপত্তি নেই বরং প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে তা ইসলামের আসল তাসাউফ। এ তাসাউফ 'এহসান' থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। কিন্তু যে বস্তুটিকে আমি পরিত্যাজ্য বলছি, তাহলো তাসাউফের রূপক, উপমা ও ভাষা ব্যবহার এবং তাসাউফের সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতি জারি রাখা। বলা বাহুল্য, সত্যিকার ইসলামী তাসাউফ এ বিশেষ খোলসের মুখাপেক্ষী নয়। এর অন্য ছাঁচও আছে। এর জন্য অন্য প্রকার ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে। উপমা ও রূপক থেকেও অব্যাহতি লাভ করা যেতে পারে। পীর-মুরিদী ও এ ব্যাপারে যাবতীয় বাস্তব আকৃতি পরিহার করে অন্য আকৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

তাহলে সেই পুরোনো ছাঁচ—যার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে জাহেলী তাসাউফের আধিপত্য চলে আসছিল—তাকে গ্রহণ করার জন্যে চাপ দেয়ার কী-ই বা প্রয়োজন ছিল। এর ব্যাপক ও বিপুল প্রচার মুসলমানদের মধ্যে যেসব কঠিন নৈতিক ও আকিদাগত রোগের সৃষ্টি করেছে, তা বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃষ্টির আগোচরে নেই। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোনো ব্যক্তি যতই নির্ভুল শিক্ষাদান করুক না কেন এ ছাঁচ ব্যবহার করার সাথে সাথেই শত শত বছরের প্রচলনের ফলে এর সাথে যেসব রোগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে সেগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটে।

কাজেই পানির ন্যায় হালাল বস্তুও যেমন ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে রোগীর জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, অনুরূপভাবে এ ছাঁচ বৈধ হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র এ কারণেই পরিত্যাজ্য যে, এরই আবরণে মুসলমানদের মধ্যে আফিমের নেশা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর নিকটবর্তী হতেই পুরাতন রোগীদের মানসপটে আবার সেই ঘুমপাড়ানীর কথা ভেসে ওঠে, যে শত শত বছর থেকে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাদেরকে নিদ্রাভিভূত করেছে। পীরের হাতে বায়াত হবার পর মুরীদের মধ্যে সেই বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি হয়, যা একমাত্র পীর মুরিদীর জন্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ "পীরের কথায় শিরাজীর রঙে রঙিন হও" —ধরনের মানসিকতা, যারপর পীর সাহেব ও গায়রুল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাদের চিন্তা ও দৃষ্টি স্থবিরত্বে পৌঁছে, সমালোচনা শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, বুদ্ধি ও জ্ঞানের ব্যবহার স্থগিত হয় এবং মন-মস্তিষ্কের ওপর শায়খের বন্দেগীর এমন পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে যার ফলে শায়খ যেন তাদের প্রতিপালক এবং তারা শায়খের প্রতিপালিত হিসেবে পরিগণিত হয়। অতপর কাশফ ও ইলহামের আলোচনা শুরু হবার সাথে সাথে মানসিক দাসত্বের বাঁধন আরো বেশী শক্তিশালী হতে থাকে। তারপর শুরু হয় সুফিদের রূপক ও উপমার প্লাবণ। এর ফলে মুরিদদের কল্পনাশক্তি যেন চাবুক খাওয়া অশ্বের ন্যায় তাদেরকে নিয়ে তীর বেগে ছুটতে থাকে। এ অবস্থায় তারা প্রতি মুহূর্তে অদ্ভুত তেলেসমাতির দুনিয়ায় সফর করতে থাকেন, বাস্তবের দুনিয়ায় অবস্থান করার সুযোগ তারা খুব কমই লাভ করে।

মুসলমানদের এ রোগ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ আলফিসানি ও হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ অনবগত ছিলেন না। উভয়ের রচনায় এর সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবত এ রোগের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁদের পূর্ণ ধারণা ছিল না। এ কারণেই তারা এই রোগীদেরকে পুনর্বার এমন পথ্য দান করেন যা এ রোগে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে তাদের উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ধীরে ধীরে আবার সেই পুরাতন রোগে আক্রান্ত হতে থাকে।[৩৭] যদিও মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) এ সত্য যথার্থরূপে উপলব্ধি করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর নীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর রচনাবলীতেই এর যথেষ্ট সাজ-সরঞ্জাম ছিল এবং শাহ ইসমাঈলের রচনাবলীও তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই সাইয়েদ আহমদের আন্দোলনেও পীর-মুরিদীর সিলসিলা চালু হয়ে গিয়েছিল। তাই সুফিবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এ আন্দোলনও মুক্ত হতে পারেনি। এমন কি সাইয়েদ আহমদের শাহাদাত লাভের পরই তাঁর সমর্থকদের মধ্যে এমন একটি দলের উদ্ভব হয় যারা শিয়াদের ন্যায় তাঁর 'অদৃশ্য' হবার কথা বিশ্বাস করেন এবং আজও তার পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছেন।

বর্তমানে যিনি তাজদীদে দীনের কাজ করতে চাইবেন তাঁকে অবশ্যি সুফিদের ভাষা-পরিভাষা, রূপক-উপমা, পীর-মুরিদী এবং তাদের পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয় এমন প্রতিটি জিনিস থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে বহুমুত্র রোগীকে যেমন চিনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় মুসলমানদেরকে অনুরূপভাবেই উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ

এ আন্দোলনকে সমালোচনার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করার সময় দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমি অনুভব করেছি, তাহলো এই যে, সাইয়েদ আহমদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ যে এলাকায় অবস্থান করে জেহাদ পরিচালনা করেন, এবং যেখানে তাঁরা ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেন, সে এলাকাটিতে পূর্ব থেকেই এ বিপ্লবের জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত করেননি। তাঁদের সেনাবাহিনী অবশ্যি উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত হয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে তাঁরা ছিলেন মোহাজিরের পর্যায়ভুক্ত। এই এলাকায় রাজনৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্যে প্রথমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে নৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে স্থানীয় লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রকে বুঝবার এবং তার সাহায্যকারী (আনসার) হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো। উভয় নেতৃবৃন্দই সম্ভবত এ বিভ্রান্তির শিকার হন যে, সীমান্তের লোকেরা যেহেতু মুসলমান এবং অমুসলিম শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত, কাজেই তারা ইসলামী শাসনকে স্বাগতম জানাবে। এ জন্যেই তাঁরা সেখানে পৌঁছেই জিহাদ শুরু করে দেবে এবং যতগুলো দেশ তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে আসে, তার সবগুলোতেই খেলাফত কায়েম করেন। কিন্তু

৩৭. হযরত মুজাদ্দিদ আলফিসানির ইন্তেকালের পর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সমর্থকবৃন্দ তাঁকে 'কাইউমে আউয়াল' ও তাঁর খলিফাদেরকে 'কাইউমে সানি' উপাধি দান করে। কাইউম খোদার একটি সিফাত।

অবশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায় যে, নামের মুসলমানকে সত্যিকার মুসলমান মনে করা এবং সত্যিকার মুসলমানের দ্বারা যে কাজ সম্ভব তাদের নিকট থেকে সে কাজের আশা রাখা একটি নিছক প্রতারণা ছিল। তারা খেলাফতের বোঝা বহন করার শক্তি রাখতো না। তাদের ওপর এ বোঝা রাখার ফলে তারা নিজেরা ভূপতিত হয়েছে এবং এ পবিত্র ইমারতটিকেও ভূপতিত করেছে।

আগামীতে প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজে ইতিহাসের এ শিক্ষাকে সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। এ সত্যটি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, যে রাজনৈতিক বিপ্লবের শিকড় সামগ্রিক চিন্তা, চরিত্র ও তমুদ্দুনের মধ্যে আমূল বিদ্ধ না থাকে, তা কোনোদিন সার্থক হতে পারে না। কোনো সাময়িক শক্তির মাধ্যমে এমন বিপ্লব কোথাও সংঘটিত হয়ে গেলেও তা স্থায়িত্বলাভ করতে পারে না। আর বিলুপ্ত হবার সময় পিছনে তার কোনো চিহ্নই রেখে যায় না।[৩৮]

তৃতীয় কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ বুজর্গগণের তুলনায় কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে আগত ইংরেজদের এমন কি শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যার ফলে তারা এখানে জাহেলী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয় ? কিন্তু এঁরা নিজেদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারলেন না ? আঠার ও উনিশ ঈসায়ী শতকের ইউরোপের ইতিহাস সম্মুখে না থাকলে এর নির্ভুল জবাব পাওয়া যাবে না। শাহ সাহেব ও তাঁর অনুগামীগণ ইসলামের সংস্কারের জন্যে যে কার্য সম্পাদন করেন, তার সমগ্র শক্তিকে তুলাদণ্ডের একদিকে এবং অন্যদিকে তার সমকালীন জাহেলিয়াতের শক্তিকে স্থাপন করলে তবেই পূর্ণরূপে অনুমান করা সম্ভব হবে যে, এ বস্তুজগতে যে নীতি-নিয়ম কার্যকরী রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ দুই শক্তির আনুপাতিক হার কি ছিল ? একথা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যদি আমি বলি যে, এ দুই শক্তির মধ্যে এক তোলা ও এক মণের সম্পর্ক ছিল। এজন্যে বাস্তবে যে ফলাফল সূচিত হয়েছে তা থেকে ভিন্নতর কিছু হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

যে যুগে আমাদের দেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগেই ইউরোপ নব শক্তি ও নব উদ্দীপনা নিয়ে মধ্য যুগের নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল। সেখানে জ্ঞান ও শিল্প অনুসন্ধানকারী, উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক এত বিপুল সংখ্যায় জন্মলাভ করেছিলেন

৩৮. এ কারণেই বর্তমানে সীমান্ত প্রদেশে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের কোনো প্রভাব অনেক অনুসন্ধানের পরও পাওয়া যায় না। এমন কি সেখানকার লোকেরা বর্তমানে বিভিন্ন উর্দু বইপত্রের মাধ্যমে তাঁদের নাম জানতে পারছে।

যে, তাঁরা সবাই মিলে এ দুনিয়ার চেহারাই পালটিয়ে দেন। এ যুগেই হিউম, কান্ট ফিশতে (Fichte), হেগেল, কোঁতে (Comet), শ্লিয়ার মাশার (Schlier Macher), ও মিল-এর ন্যায় দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। তারা তর্কশাস্ত্র, দর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং যুক্তিবিদ্যার সমগ্র শাখা-প্রশাখায় বিপ্লব সাধন করেন। এ যুগেই শরীর বিদ্যায় গ্যালভানী (Galvani) ও ভলটা (Volta), রসায়নশাস্ত্রে ল্যাভয়সিয়র (Lavoisier), প্রিষ্টলি (Priestley), ডেভী (Devy) ও বার্জিলিয়াস (Berzilivs) এবং জীব বিদ্যায় লিনে (Linne), হলার (Häller), বিশাত (Bichat) ও উলফ (Wolf)-এর ন্যায় পণ্ডিতদের আবির্ভাব হয়। তাদের গবেষণা শুধু বিজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক হয়নি বরং বিশ্বজাহান ও মানুষ সম্পর্কে একটি নয়া মতবাদেরও জন্ম দেয়। এ যুগেই কুইসনে (Quisney), টার্গট (Turgot), এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ও ম্যালথাসের গবেষণার মাধ্যমে নয়া অর্থনীতি বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ যুগেই ফ্রান্সে রুশো, ভল্টেয়ার, মন্টিসকো, ডেনিস ডাইডর্ট (Denis Diderot), লা ম্যাটরি (La-mattrie), ক্যাবানিস (Cabanis), বাফন (Buffon) ও রোবিনেট (Robinet), ইংল্যাণ্ডে টমাসপেন (Thomaspoune), উইলিয়াম গডউইন (William Godwin), ডেভিড হার্টলে (David Hartley), জোসেফ প্রিস্টলে (Joseph-priestly) ও এরাসমাস ডারউইন এবং জার্মানীতে গেটে, হার্ডার, শিলার (Schiler), উইনেকলম্যান (Winekelmann), লিসিং (Lessing), ও হোলবাস (Holbach) এবং আরো অনেক গবেষকের জন্ম হয়। তাঁরা নৈতিক দর্শন, সাহিত্য, আইন, ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজবিদ্যার সকল শাখায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা নির্ভীকভাবে প্রাচীন মতবাদ ও চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করে চিন্তার এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করেন।

প্রেসের ব্যবহার, প্রচারের আধিক্য, আধুনিক প্রকাশভংগী ও কঠিন পরিভাষার পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার কারণে তাঁদের চিন্তার ব্যাপক প্রচার হয়। তাঁরা মাত্র গুটিকয় ব্যক্তিকে নয় বরং বিভিন্ন জাতিকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেন। পুরাতন মানসিকতা, নৈতিক বৃত্তি ও রীতি-প্রকৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবনাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা এবং তমুদ্দুন ও রাজনীতির সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে তাঁরা আমূল পরিবর্তন করেন।

এ যুগেই ফরাসী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এর থেকে একটি সভ্যতার জন্ম হয়। এ যুগেই যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। ফলে একটি নতুন তমুদ্দুন, নতুন শক্তি ও নয়া জীবন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ যুগেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। এর ফলে ইউরোপ এমনসব শক্তির অধিকারী হয়, যা ইতিপূর্বে আর কোনো জাতির ছিল না। এ যুগেই

পুরাতন যুদ্ধনীতির স্থলে নয়া যুদ্ধনীতি, নয়া যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ পদ্ধতির প্রচলন হয়। দস্তুরমতো ড্রিলের মাধ্যমে সৈন্যদেরকে সংগঠিত করার পদ্ধতি গৃহীত হয়। এর ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাদল মেশিনের ন্যায় আন্দোলিত হতো এবং পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষিত সেনাদল তাদের মোকাবিলায় তিষ্ঠাতে পারতো না। সৈন্যদের ট্রেনিং, সেনাদল বিভাগ ও যুদ্ধ কৌশলের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং প্রতিটি যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে এ শিল্পটাকে অনবরত উন্নত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অনবরত আবিষ্কারের মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। রাইফেল আবিষ্কার হয়। হাল্কা ও দ্রুত বহনকারী মেশিনগান তৈরী করা হয়, কেল্লা ধ্বংসকারী মেশিনগান পূর্বের চাইতে শক্তিশালী করে তৈরী করা হয় এবং সর্বোপরি কার্তুজের আবিষ্কার নয়া বন্দুকের মোকাবিলায় পুরানো পাউডার বন্দুককে একেবারেই অকেজো প্রমাণ করে। এ কারণেই ইউরোপে তুর্কীদেরকে এবং ভারতবর্ষে দেশীয় রাষ্ট্রগুলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় অনবরত পরাজয় বরণ করতে হয় এবং মুসলিম জাহানের কেন্দ্রস্থলে হামলা করে নেপোলিয়ান মুষ্টিমেয় সেনানীর সাহায্যে মিসর দখল করেন।

সমকালীন ইতিহাসের পাতায় মোটামুটি একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই একথা সহজেই পরিস্ফুট হবে যে, আমাদের এখানে মাত্র কতিপয় ব্যক্তি জাগ্রত হন। এখানে জীবনের কেবলমাত্র একদিকে সামান্য একটু কাজ হয়। কিন্তু সেখানে জীবনের প্রতিটি দিকে হাজার গুণ বেশী কার্য সম্পাদিত হয়। বরং জীবনের এমন কোনো দিক ছিল না যেখানে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পুত্রগণ বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে কতিপয় কিতাব লেখেন। তাঁদের এ কিতাবগুলো অত্যন্ত সীমিত পরিবেশে পৌঁছেই আটকে থাকে। আর সেখানে প্রতিটি বিদ্যা-শিল্পের ওপর কিতাব লিখে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ভর্তি করা হয়। তাদের কিতাবসমূহ সমগ্র দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়। অবশেষে মানুষের মন-মগজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এখানে দর্শন, নৈতিক চরিত্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ভিত্তিতে নয়া বুনিয়াদ স্থাপনের আলোচনা নেহাত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। পরবর্তীকালে তার ওপর আর কোনো কাজ হয়নি। আর সেখানে ইত্যবসরে এসব সমস্যার ওপর পূর্ণাংগ চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। এ চিন্তাধারা সমগ্র চিত্র পরিবর্তিত করে। এখানে শরীর বিদ্যা ও বস্তুশক্তি সম্পর্কিত বিদ্যা পাঁচশো বছর আগের ন্যায় একই পর্যায়ে অবস্থান করে, আর সেখানে এ ক্ষেত্রে এতবেশী উন্নতি সাধিত হয় এবং সেই উন্নতির কারণে পাশ্চাত্যবাসীদের শক্তি এত বেড়ে যায় যে,

তাদের মোকাবিলায় পুরাতন যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের জোরে সাফল্য লাভ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর যুগে ইংরেজ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এলাহাবাদ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শাহ্ সাহেব এ নয়া উদীয়মান শক্তির ব্যাপারে কোনো খোঁজ-খবর নেননি। শাহ্ আবদুল আজীজের যুগে দিল্লীর বাদশাহ্ ইংরেজদের নিকট থেকে পেনশন লাভ করতো ; আর প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনে কখনো এ প্রশ্ন জাগেনি যে, এ জাতিটি কেমন করে এতো অগ্রসর হচ্ছে এবং এ নয়া শক্তির পেছনে কোন্ শক্তি কার্যকরী আছে ? সাইয়েদ সাহেব ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ কার্যতঃ ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্যে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা যাবতীয় ব্যবস্থা ও আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু জ্ঞানী ও বিচক্ষণ আলেমদের একটি দলকে ইউরোপে প্রেরণ করতে পারেননি—যাঁরা সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান চালাতেন যে, কোন্ শক্তির জোরে এ জাতিটি তুফানের বেগে অগ্রসর হচ্ছে এবং নয়া উপকরণ, নয়া পদ্ধতি ও নয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে অভিনব শক্তি ও উন্নতি লাভ করছে ? এর কারণ কি ? তারা নিজেদের দেশে কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে ? তারা কোন্ ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী ? তাদের তমুদ্দুন কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এবং তার মোকাবিলায় আমাদের নিকট কোন্ জিনিসের অভাব আছে ? যখন তাঁরা জিহাদে অবতীর্ণ হন, তখন একথা কারোর অবিদিত ছিল না যে, ভারতবর্ষে শিখদের নয় ইংরেজদের শক্তিই হলো আসল শক্তি, আর ইংরেজদের বিরোধিতাই ইসলামী বিপ্লবের পথে সবচাইতে বড় বিরোধিতা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘর্ষে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার প্রয়োজন ছিল তার মোকাবিলায় নিজের শক্তির পরিমাপ করা এবং নিজের দুর্বলতাসমূহ অনুধাবন করে সেগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত ছিল। আমি বুঝতে পারি না, এ বুজর্গদের দূরদর্শী দৃষ্টি থেকে বিষয়টির এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি প্রচ্ছন্ন রইলো কেমন করে ! বলা বাহুল্য, এ ভুলটি যখন তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তখন এ কার্য কারণের জগতে এ ধরনের ভুলের ফলাফল থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পেতে পারতেন না।

শেষকথা

পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলামী পুনরুজ্জীবনের এ আন্দোলনটি যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়, তা থেকে আমরা প্রথমতঃ এ শিক্ষা

গ্রহণ করি যে, ইসলামী পুনরুজ্জীবনের জন্যে নিছক দীনি এল্‌মকে পুনরুজ্জীবিত ও শরীয়াতের প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত করাই যথেষ্ট নয় বরং একটি ব্যাপক ও বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন। এ আন্দোলন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা, শিল্প, বাণিজ্য তথা জীবনের সকল বিভাগে নিজের প্রভাব পরিব্যাপ্ত করবে এবং সকল সম্ভাব্য শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করবে। এ থেকে আমরা দ্বিতীয় শিক্ষা লাভ করি এই যে, বর্তমানে তাজদীদের কাজ করার জন্যে নতুন ইজতিহাদী শক্তি প্রয়োজন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (র) ও তাঁর পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদগণের কর্মকাণ্ডে যে ইজতিহাদী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানের জন্যে নিছক ততটুকুই যথেষ্ট হবে না। আধুনিক জাহেলিয়াত বিপুল উপকরণ সহ আবির্ভূত হয়েছে এবং অসংখ্য জীবন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ বা তাঁর পূর্ববর্তীগণের মনে এসব সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণাই ছিল না। একমাত্র সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে নবী করীম (স) এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কাজেই এ যুগে মিল্লাতের সংস্কারের কাজের জন্যে একমাত্র খোদার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের উৎস থেকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করা যেতে পারে। আর এ নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর বর্তমান অবস্থায় বৃহত্তর কর্মপন্থা প্রণয়নের জন্যে এমন স্বতন্ত্র ইজতিহাদী শক্তির প্রয়োজন, যা পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের কারোর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও পদ্ধতির অনুগত হবে না, অবশ্যি তাদের প্রত্যেকের ইজতিহাদ থেকে উপকৃত হবে এবং কাউকে উপেক্ষা করবে না।

পরিশিষ্ট

ইতিপূর্বে পঞ্চম সংস্করণের (উর্দু) ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ কিতাবের সাথে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। এ কিতাবের আলোচনায় আমি যেসব প্রসংগের অবতারণা করেছি সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তার যে জবাব আমি দিয়েছি, তা একত্রিত করে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করাই এর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় যেসব প্রশ্ন আমার নিকট এসেছে, তা জবাব সহ এখানে উদ্ধৃত করছি। আশা করি, এগুলো অধ্যয়ন করার পর—আর যাঁদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন ও সন্দেহ আছে—তাদের প্রশ্ন ও সন্দেহ নিরসনের জন্যও এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী হবে।

প্রশ্ন

'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' কিতাবটি যে কত উন্নতমানের আলোচনা সম্বলিত তা "মুজাদ্দিদের কাজ কি" শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধ ও বিভিন্ন মুজাদ্দিদগণের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ থেকে যে কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি অবশ্যি অনুমান করতে পারবেন। তবুও এর কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সেগুলো নীচে উল্লেখ করছি ঃ

১. ইমাম গাজ্জালী (র)-এর আলোচনার শেষের দিকে আপনি যে তিনটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ (ক) হাদীস শাস্ত্রে ইমামের দুর্বলতা, (খ) তাঁর ওপর যুক্তিবাদিতার আধিপত্য এবং (গ) তাসাউফের দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝুঁকে পড়া। ইমামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এহইয়াউল উলুম ও কিমিয়ায়ে সাআদাত থেকে কি এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় ? এ কিতাবগুলোয় তিনি যে তাসাউফ বর্ণনা করেছেন, তা কি ক্রটিমুক্ত নয় ? উপরন্তু যুগের মুজাদ্দিদকে কি তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গের তুলনায় বেশী পরিমাণ নির্ভুল জ্ঞান দান করা হয় না ? অন্যথায় সমগ্র যুগে তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন কেন ?

২. মুজাদ্দিদে আলফিসানী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে, 'হযরত মুজাদ্দিদে আলফিসানির যুগ থেকে নিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে বাধে, তাহলো এই যে,—তাঁরা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি এবং অজানিতভাবে তাঁদেরকে পুনর্বার সেই খাদ্য দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্ণরূপে দূরে রাখার প্রয়োজন ছিল।' হযরত মুজাদ্দিদ ও শাহ সাহেব সম্পর্কে একথা মেনে নেয়া কঠিন যে, তাঁদের দৃষ্টি এতো অপরিপক্ক ছিল—যার ফলে তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ সম্পর্কে তাঁরা পুরোপুরি ধারণা করতে পারেননি। তাঁরা জাগতিক বিদ্যার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক বিদ্যারও (কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে) যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া তাঁরা মুজাদ্দিদ হবার দাবীও করেন, একথা মাওলানা আজাদ তাঁর 'তাজকিরা'য় উল্লেখ করেছেন। হযরত মুজাদ্দিদ তাঁর পত্রাবলীতে লিখেছেন যে, নবুয়াতের হাজার বছর পর তিনিই মুজাদ্দিদরূপে আগমন করেছেন। এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উদ্ভব হয় ঃ

(ক) হযরত মুজাদ্দিদ ও শাহ সাহেব নিজেদেরকে যে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা করেন, তাঁদের এ ঘোষণা কি খোদার নির্দেশানুযায়ী ছিল না ? উপরন্তু তাঁদের রচনাবলীতে যে কাশফ ও ইলহামের উল্লেখ আছে তাঁর তাৎপর্য কি ? তাঁরা শরীয়তের আইন অনুযায়ী মুজাদ্দিদ হন, না প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী ?

(খ) এ ধারণা কি সত্য যে, মুজাদ্দিদ অবশ্যি তাঁর জামানার বিশিষ্ট ব্যক্তি হন ? তিনি শ্রেষ্ঠতম শরীয়তবিদ ও দীনি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন ? এবং এ সংগে তিনি খোদার নিকটতম ব্যক্তিও হন ? অন্যথায় আর সবাইকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাঁকে এই বিরাট কার্য সম্পাদনের জন্যে নির্বাচিত করা হয় কেন ?

(গ) 'মুবাশ্‌শিরাত'–সুসংবাদসমূহের তাৎপর্য কি ?

(ঘ) প্রতি শতকের অগ্রভাগে একজন করে মুজাদ্দিদের আগমন হবে, এ হাদীস কি সত্য নয় ? আর নিজের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে কি তিনি অবগত থাকবেন না ? এটা কি তার জন্যে জরুরী নয় ?

৩. ইমাম মেহদী সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে, তিনি সাধারণ আলেমগণের বর্ণনা থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হবেন। অথচ আলেমগণের নিকট শুনেছি যে, ইমামের নাম ও বংশ ছাড়াও আরো ভিন্ন আলামত হাদীসে উল্লিখিত আছে। তিনি বিশেষ পরিবেশে বিশেষ আলামতসহ আবির্ভূত হবেন। লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলবে এবং জোরপূর্বক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে তাঁকে শাসক নিযুক্ত করবে। আর ইত্যবসরে আসমান থেকে আওয়াজ আসবে যে, ইনি আল্লাহর খলীফা ইমাম মেহদী। কিন্তু আপনি বলছেন যে, "দাবীর মাধ্যমে কার্যারম্ভ করার অধিকার নবী ছাড়া আর কারোর নেই এবং নবী ছাড়া আর কেউ-ই নিশ্চিতভাবে জানেন না যে, তিনি কোন্ খেদমতে নিযুক্ত হয়েছেন। মেহদীবাদ দাবী করার জিনিস নয়, কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে যাবার জিনিস। এ ধরনের দাবী যারা করেন আর যারা তার উপর ঈমান আনেন, আমার মতে তারা উভয়ই নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও নিম্নস্তরের মানসিকতার পরিচয় দেন।"

আমার প্রশ্ন হলো উপরোল্লিখিত আলামত ও অবস্থা বহু আলেম (যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর বই বেহেশতী জেওর দেখুন বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এ বর্ণনাবলী কি নির্ভুল হাদীস ভিত্তিক নয় ? যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনার বর্ণনার পেছনে কি যুক্তি আছে ?

জবাব

আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব দেবার পরিবর্তে আমি কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করা জরুরী মনে করি, যেগুলো হৃদয়ংগম করার পর আপনার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।

এক ঃ আমাদের নিকট এমন কোনো উপায়-উপকরণ নেই, যার মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলতে পারি যে, অমুক ব্যক্তি মুজাদ্দিদ ছিল আর অমুক ছিল না। কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে পরবর্তী যুগের লোকেরা বা তাঁর সমকালীন জনসমাজ তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে রায় কায়েম করে এসেছে। আগের বহুলোক সম্পর্কে আলেম সমাজ এ রায় রাখেন যে, তাঁরা মুজাদ্দিদ ছিলেন। কিন্তু আবার অনেকে তাঁদেরকে মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেননি। তাঁদের কারোর সাথে কোনো আলামতও নেই যার সাহায্যে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

দুই ঃ তাজদীদ কোনো দীনি মর্যাদার নাম নয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তির শরীয়তের আইন অনুযায়ী মুজাদ্দিদ হবার প্রশ্নই নেই এবং তাঁকে মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করা না করার ফলে কোনো ব্যক্তির দীনি আকিদার ওপর ভালো-মন্দ প্রভাব পড়ে না। এটি একটি পদমর্যাদা। কোনো ব্যক্তির কার্যাবলীর প্রেক্ষিতেই তাঁকে এ পদমর্যাদা দান করা হয়। কোনো ব্যক্তি দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে যে কোনো পর্যায়ের কোনো কার্য সম্পাদন করেন তাঁকে মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে। অবশ্যি অন্য কারোর মতে ঐ ব্যক্তির কার্যটি যদি উল্লিখিত মর্যাদার অধিকারী না হয়, তাহলে তিনি তাঁর মুজাদ্দিদের মর্যাদা অস্বীকার করতে পারেন। অবিবেচক লোকেরা এ বিষয়টিকে অনর্থক গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। নবী করীম (স) যে খবর দিয়েছিলেন, তা শুধু এতটুকুনই ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা এ দীনকে বিলুপ্ত হতে দেবেন না বরং প্রত্যেক শতকের অগ্রভাগে এমন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটাবেন যিনি বা যাঁরা ইসলামের অস্পষ্ট চিন্তাগুলোকে পুনর্বার সুস্পষ্ট করবেন। হাদীসে উল্লেখিত "মান" শব্দটি আরবীতে কেবল এক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এর অর্থ বহু ব্যক্তিও হয়। এ হাদীসে এমন কোনো শব্দও নেই যার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুজাদ্দিদকে নিজের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে অথবা লোকদের জন্যে তাঁকে মুজাদ্দিদ বলে চিনে নেয়া জরুরী হবে।

তিন ঃ কোনো ব্যক্তির মুজাদ্দিদ হবার অর্থ এ নয় যে, তিনি সবদিক দিয়ে একজন 'মরদে কামেল'—আদর্শ ব্যক্তি এবং তাঁর কার্যাবলী দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তাকে মুজাদ্দিদ মেনে নেবার জন্যে কেবল তার সামগ্রিক কার্যাবলীর এ সাক্ষ্যদানই যথেষ্ট যে, তা সংস্কারমূলক। কিন্তু কাউকে মুজাদ্দিদ বলে মেনে নেবার পর তাঁকে নির্দোষ ও নিষ্পাপ মনে করলে এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথার ওপর ঈমান আনলে আমাদের বিরাট ভুল হবে। নবীর ন্যায় মুজাদ্দিদ নিষ্পাপ হন না।

চার ঃ উম্মতের মুজাদ্দিদগণের কার্যাবলীর ওপর আমি যে মন্তব্য করেছি তা অবশ্যি আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার যে কোনো মতের সাথে বিরোধ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। আমি যেসব যুক্তির ভিত্তিতে কোনো মত প্রকাশ করেছি তার ওপর যদি আপনি নিশ্চিন্ত হন তো ভালই ; আর যদি নিশ্চিন্ত না হন, তাহলেও কিছু আসে যায় না। তবে আমি এতটুকুন অবশ্যি চাই যে, যুক্তি ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কোনো মতকে বর্জন বা গ্রহণ করবেন—বুযর্গ পূজার প্রবণতায় প্রভাবিত হয়ে নয়।

পাঁচ ঃ বিগত জামানায় কোনো কোনো মনীষী অবশ্যি নিজেদের সম্পর্কে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এ খবর দেন যে, তাঁরা নিজেদের জামানার মুজাদ্দিদ। কিন্তু তাঁরা এ অর্থে কোনো দাবী করেননি যে, তাঁদেরকে মুজাদ্দিদ মেনে নেয়া লোকদের জন্যে জরুরী এবং যে তাঁদেরকে স্বীকার করবে না সে গোমরাহ। দাবী করে তা স্বীকার করার জন্যে আহ্বান জানানো এবং তা স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করা আদৌ কোনো মুজাদ্দিদের কাজ নয়। যিনি এ কাজ করেন, তিনি নিজেই তাঁর এ কাজ থেকে প্রমাণ করেন যে, তিনি আসলে মুজাদ্দিদ নন।

ছয় ঃ কাশফ ও ইলহাম ওহির ন্যায় কোনো নিশ্চিত জিনিস নয়। তার মধ্যে এমন কোনো অবস্থা হয় না, যার ফলে যে ব্যক্তির কাশফ হয়, তিনি উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন যে, এ কাশফ বা ইলহাম খোদার পক্ষ থেকে হচ্ছে, এর মধ্যে কমবেশী বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। এজন্যেই আলেমগণ একথা স্বীকার করেন যে, কাশফ ও ইলহামের সাহায্যে শরীয়তের কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয় না। এবং এই উপায়ে লব্ধজ্ঞান দলিল নয় এবং যে ব্যক্তির কাশফ হয় তার জন্যেও খোদার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের মানদণ্ডে যাঁচাই না করে কোনো কাশফ ও ইলহাম লব্ধ বস্তুর আনুগত্য করা জায়েয নয়।

সাত ঃ ইমাম মেহেদী সম্পর্কে আমি এখানে যা কিছু লিখেছি আমার কিতাব 'রাসায়েল ও মাসায়েলে' সে সম্পর্কে এর চাইতেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৩৯] মেহেরবানী করে এসব আলোচনা দেখুন। এ থেকে আপনি জানতে পারবেন যে, উল্লেখিত হাদীসগুলোর ব্যাপারে আলেমগণ যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে আমি কি অনুসন্ধান চালিয়েছি। আমি ঐ সকল আলেমকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু কোনো আলেমের প্রত্যেকটি কথা মেনে নেবার অভ্যাস আমার নেই।–(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১)

৩৯. এ গ্রন্থের ১৬১ থেকে ১৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত এ আলোচনা দেখুন।

কাশফ ও ইলহামের তাৎপর্য এবং কতিপয় মুজাদ্দিদের দাবী

প্রশ্ন

আপনার তর্জমানুল কুরআন পত্রিকার ১৯৫১ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন যে, "বিগত যুগের কতিপয় বুযর্গ অবশ্যি নিজেদের সম্পর্কে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এ খবর দেন যে, তাঁরা নিজেদের জামানার মুজাদ্দিদ। কিন্তু এ অর্থে কোনো দাবী করেননি যে, তাঁদেরকে স্বীকার করে নেয়া লোকদের জন্যে জরুরী এবং যে তাঁদেরকে স্বীকার করবে না সে গোমরাহ।" আপনার একথা সত্য মনে হয় না। কেননা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) অনায়াসে দাবী করে বসেছেন যে, 'আমাকে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, তুমি এ জামানার ইমাম। লোকদের তোমার অনুসরণকে নাজাতের উপায় মনে করা উচিত।' উদাহরণ স্বরূপ তাফহীমাতে ইলাহিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা দেখুন। হযরত শাহ সাহেবের এ দাবী সত্য ছিল কিনা? যদি তাঁর দাবী সত্য হয়, তাহলে আপনার একথা সত্য নয়, যা আপনি উপরোল্লিখিতের পর লিখেছেন যে,

> "দাবী করে তাকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য আহ্বান জানানো এবং তাকে স্বীকার করাবার চেষ্টা করা আদৌ কোনো মুজাদ্দিদের কাজ নয়।" আবার আপনি উপরোল্লিখিত বাক্যের পর লিখেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে নিজেই নিজের কাজ থেকে একথা প্রমাণ করে যে, সে আসলে মুজাদ্দিদ নয়।"

আপনার এ কথাগুলোর ভিত্তি কি ? কুরআন মজীদ, নবী করীমের হাদীস, না আপনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ ফতোয়া দিয়েছেন ? একই পত্রিকার একই পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ নম্বরে আপনি লিখেছেন ঃ

> "কাশফ ও ইলহাম ওহির ন্যায় কোনো নিশ্চিত জিনিস নয়। তার মধ্যে এমন কোনো অবস্থা হয় না, যার ফলে যে ব্যক্তির কাশফ হয়, তিনি উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন যে, এ কাশফ বা ইলহাম খোদার পক্ষ থেকে হচ্ছে।"

আপনার একথাও আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছেন, না এটাও আপনার ইজতিহাদ ? অথবা কুরআন মজীদ বা রসূলের হাদীসের ভিত্তিতে একথা বলছেন ?

মুসলিম জাতির কামেল ব্যক্তিগণের কাশফ ও ইলহামের অবস্থা যদি এই হয়ে থাকে, তাহলে তারা যে উত্তম জাতি তারই বা দশা কি ? অথচ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে মহিলারাও খোদার ওহি লাভ করতেন। আবার খোদার এমন বান্দাও ছিলেন, যাদের কাশফ ও ইলহাম এমন উন্নত পর্যায়ের ছিল যে, একজন মহানবীকেও প্রশ্ন করে লজ্জিত হতে হয়। কিন্তু সুবহানাল্লাহ ! মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের কামেল ব্যক্তিগণের কাশফ ও ইলহাম এমন অদ্ভূত ধরনের ছিল যে, এসব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিনা, এ সম্পর্কে তারা নিশ্চিতভাবে জানতেন না। তাহলে যে সমস্ত কাশফ ও ইলহামে দীনের কোনো লাভ ছিল না এবং যাদের ওপর এসব অবতীর্ণ হতো তাদের ঈমান যখন এর ফলে বৃদ্ধি হতো না বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার কারণে এগুলো এক ধরনের আপদ ছিল, তখন তাদের ওপর সে সমস্ত কাশফ ও ইলহাম অবতীর্ণ করার আল্লাহ তায়ালার কি প্রয়োজন ছিল ?

জবাব

ওহি ও ইলহামের বিভিন্ন অর্থ সংমিশ্রিত করে আপনি ভুল করছেন। এক ধরনের ওহি আছে যাকে 'জিবিল্লী' বা প্রাকৃতিক ওহি বলা হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তার কর্তব্য শিক্ষা দেন। এ ওহি মানুষের তুলনায় জানোয়ারদের ওপর এবং সম্ভবতঃ তার তুলনায় উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের ওপরই বেশী অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ধরনের ওহিকে বলা হয় আংশিক ওহি। এ ওহির মাধ্যমে কোনো বিশেষ সময় আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে জীবন সমস্যার মধ্য থেকে কোনো এক সমস্যা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান, কোনো হেদায়েত অথবা কোনো কৌশল শিক্ষা দান করেন। এ ওহি সাধারণ মানুষের ওপর প্রায়শঃই অবতীর্ণ হয়। ওহির বদৌলতেই দুনিয়ার বড় বড় আবিষ্কারসমূহ সাধিত হয়েছে। বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ঘটনা এরি মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে এরি শক্তি সক্রিয় দেখা যায়। কোনো বিশেষ সময় কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ এক ব্যক্তির মনে একটি চিন্তার উদয় হয় এবং তার মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের গতিধারার ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেন। হযরত মূসা (আ)-এর মাতার ওপর এ ধরনের ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল। এ দুই ধরনের ওহি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর এক ধরনের ওহি আছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নিজের কোনো বান্দাকে অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত করান, তাঁকে জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ

দান করেন, যাতে করে তিনি সেই জ্ঞান ও নির্দেশকে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন। এ ওহী একমাত্র নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়। কুরআন থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এ ধরনের জ্ঞান—তাকে 'এলকা', 'কাশফ' বা 'ইলহাম' যাই বলা হোক না কেন অথবা পারিভাষিক অর্থে তাকে 'ওহি' আখ্যাদান করা হলেও তা একমাত্র রসূল ও নবী ছাড়া কারোর ওপর অবতীর্ণ হয় না। উপরন্তু এ জ্ঞান নবীদেরকে এমনভাবে দান করা হয়, যার ফলে এটি যে খোদা প্রদত্ত, শয়তানের অনুপ্রবেশমুক্ত এবং নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, ধারণা, ইচ্ছা ও বাসনার ছিটেফোঁটাও এর মধ্যে নেই, সে সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা লাভ করা হয়। এ জ্ঞানই শরীয়তের দলিল ও প্রমাণ স্বরূপ এবং এর আনুগত্য প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফরজ। এ জ্ঞান অন্য মানুষের নিকট পৌঁছাবার এবং এর ওপর ঈমান আনার জন্যে খোদার সকল বান্দার প্রতি আহ্বান জানাবার উদ্দেশ্যেই নবীগণ নিযুক্ত হন।

নবী ছাড়া অন্য কোনো মানুষ যদি কখনও এ তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাহলে তা এতোই আবছা ও অস্পষ্ট ইশারার পর্যায়ে থাকে যে, তাকে যথাযথভাবে বুঝবার জন্যে নবীর ওপর অবতীর্ণ ওহির আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাতের মানদণ্ডে তার সত্য-মিথ্যা যাঁচাই করা এবং সত্য হলে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা)। এছাড়া যে ব্যক্তি তার ইলহামকে হেদায়েতের স্বতন্ত্র মাধ্যম মনে করে এবং নবীর ওপর অবতীর্ণ ওহির মানদণ্ডে যাঁচাই না করেই তাকে কার্যকরী করে এবং অন্যকেও তার অনুসরণ করার জন্যে আহ্বান জানায়, তার অবস্থা সরকারী টাঁকশালের মোকাবিলায় নিজের টাঁকশাল চালুকারী জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারীর ন্যায়। তার এ কার্যই প্রমাণ করে যে, আসলে খোদার পক্ষ থেকে তার নিকট ইলহাম হয়নি।

এ পর্যন্ত আমি যা কিছু বললাম, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথাগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা 'জ্বীন'-এর আয়াতে এ বিষয়টিকে একেবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًاo اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًاo لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا o(الجن : ٢٨)

আপনি যদি একথাটি বুঝবার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি নিজেই জানতে পারবেন যে, উম্মতের সৎ ও সংশোধন কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে নবীর ন্যায় কাশফ ও ইলহাম দান না করার কারণ কি ? প্রথম জিনিসটি আল্লাহ তায়ালা এজন্যে দান করেননি যে, নবী ও উম্মতের মধ্যে এরি ভিত্তিতে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। কাজেই একে কেমন করে দূর করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় জিনিসটি দেবার কারণ হলো এই যে, নবীর পর যেসব লোক তাঁর কার্যাবলীকে জারী রাখার চেষ্টা করেন, তাঁরা ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে খোদার পক্ষ থেকে সঠিক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী হন। এ জ়িনিসটি অবচেতনভাবে প্রত্যেক আন্তরিকতাসম্পন্ন ও নির্ভুল চিন্তা সমন্বিত ইসলাম সেবীকে দান করা হয়। কিন্তু যদি কাউকে সচেতনভাবে দান করা হয়, তাহলে সেটা খোদার পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ।

আপনার দ্বিতীয় মৌলিক ত্রুটি হলো এই যে, আপনি নবী ও অ-নবীর মর্যাদার নীতিগত পার্থক্যকে আদৌ বুঝেননি। কুরআনের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র নবীই এ মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী খোদার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন এবং একমাত্র তিনিই মানুষকে তাঁর ওপর ঈমান আনার ও তাঁর আনুগত্য কবুল করার জন্যে আহ্বান করার অধিকার রাখেন। এমন কি যে তাঁর ওপর ঈমান আনে না সে খোদাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও কাফের হয়ে যায়। দীনী ব্যবস্থায় নবী ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদার অধিকারী নয়। যদি কেউ এ মর্যাদার দাবীদার হয়, তাহলে আমরা তার দাবীর বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করবো না বরং তাকে নিজের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা উচিত। তাঁকে অবশ্যি বলতে হবে যে, কুরআন ও হাদীসে কোথায় নবী ছাড়া অন্য কাউকে এ অধিকার দান করা হয়েছে যে, তিনি মানুষের সম্মুখে তাঁর এই পদে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবী করবেন এবং এ দাবী মেনে নেয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানাবেন ? তাছাড়া যে এই দাবী স্বীকার করবে না, সে নিছক দাবীদারের দাবীকে স্বীকার না করার কারণে জাহান্নামী ও কাফের হয়ে যাবে, একথাও অবশ্যি তাঁকে প্রমাণ করতে হবে।

এর জবাব যদি কেউ من يجدد لها دينها-এর বরাত দেন অথবা মেহদীর আগমন সম্পর্কিত হাদীসগুলো পেশ করেন তাহলে আমি বলবো যে, সেখানে কোথাও মুজাদ্দিদ বা মেহদীকে উপরোল্লিখিত অধিকার দান করা হয়নি। সেখানে কি একথা লেখা আছে যে, তাঁরা নিজেদেরকে মুজাদ্দিদ বা মেহদী বলে দাবী করেন আর যারা সে দাবী মানবে একমাত্র তারাই মুসলমান থাকবে আর বাকী সবাই কাফের হয়ে যাবে ?

উপরন্তু এর জবাবে একথা বলাও অসংগত যে, যে ব্যক্তি দীনের পুনরুজ্জীবন ও দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর সাথে সহযোগিতা না করে তাঁর বিরোধিতা করা নাজাতের কারণ হতে পারে না। এতে সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কাজ হামেশা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারিতে পরিণত হয়। এ কাজের সহযোগী হওয়াই মানুষের হক পরস্ত হবার আলামত। তবে এ নীতির ভিত্তিতে এ পার্থক্য সৃষ্টি হয় যে, দীনের পুনরুজ্জীবন ও দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। কিন্তু কোনো দাবীদারের দাবীকে স্বীকার করে নেয়া যে ঈমানের দাবী এবং নিছক এক ব্যক্তির মুজাদ্দিদ অথবা মেহদী হবার দাবী স্বীকার না করা হলেই নাজাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

এবার শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) ও মুজাদ্দিদে আলফিসানি (র)-এর দাবীর আলোচনায় আসা যাক। আমি এজন্যে যথেষ্ট নিন্দিত যে, পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে আমি নিষ্পাপ মনে করি না, তাঁদের নির্ভুল কাজকে নির্ভুল বলার সাথে সাথে তাঁদের ভুলটিকেও ভুল বলে থাকি। আমার আশংকা, এ ব্যাপারেও যদি কিছু দ্ব্যর্থহীন আলোচনা করি, তাহলে আমার অপরাধগুলোর মধ্যে আরো একটি অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের চাইতে খোদাকে অধিক ভয় করা উচিত। তাই যে যা বলুন না কেন, আমি অবিশ্য একথা না বলে থাকতে পারি না যে, নিজেদের সম্পর্কে এ উভয় মনীষীর মুজাদ্দিদ দাবী এবং নিজেদের বক্তব্যকে বার বার কাশফ ও ইলহামের বরাত দিয়ে পেশ করা তাঁদের অন্যতম ক্রুটি। আর তাদের এ ক্রুটিই পরবর্তীকালে বহু ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিকে বিভিন্ন দাবী করার ও উম্মতের মধ্যে নতুন ফিতনা সৃষ্টি করার সাহস জুগিয়েছে। কোনো ব্যক্তি ইসলামী পুনরুজ্জীবনের জন্যে যদি কোনো কার্য সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করে, তাহলে তার তা সম্পাদন করা উচিত, অতপর খোদার নিকট তার কি মর্যাদা হবে, সে বিষয়টির সিদ্ধান্ত খোদার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিয়ত ও কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং নিজের মেহেরবানীতে সেগুলো কবুল করে আখেরাতে মানুষকে যে মর্যাদা দান করেন, সেটিই মানুষের আসল মর্যাদা। মানুষ নিজে যে মর্যাদা দাবী করে অথবা লোকেরা তাঁকে যে মর্যাদা দান করে সেটি তার আসল মর্যাদা নয়। নিজের জন্যে নিজেই উপাধি ও পদবী নির্ণয় করা, দাবী সহকারে সেগুলো বিবৃত করা এবং নিজ মুখে নিজের মর্যাদার কথা ঘোষণা করা কোনো ভালো কাজ নয়। পরবর্তীকালে সুফীসুলভ মনোভাব ও রুচি এ জিনিসটিকে বরদাশত করে নেয় এবং একে চমৎকারিত্ব দান করে। এমন কি মহান ব্যক্তিরাও এ বিষয়টির মধ্যে কোনো গলদ দেখতে পাননি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন,

তাবে-তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণের আমলে এর অস্তিত্বই ছিল না। আমি শাহ সাহেব ও মুজাদ্দিদ সাহেবের কার্যকে অত্যন্ত সম্মান করি এবং তাঁদের কোনো ভক্তের চাইতে আমি তাঁদেরকে কম শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু তাঁদের যেসব কার্যাবলী আমি বুঝতে অক্ষম হয়েছি, তার মধ্যে এটি অন্যতম। আর সত্যি বলতে কি তাঁরা কাশফ ও ইলহামের বরাত দিয়ে তাঁদের কথা পেশ করেন, নিছক এজন্যে আমি কখনো তাঁদের কোনো কথা স্বীকার করিনি। বরং যখনই স্বীকার করেছি, একমাত্র এজন্যে স্বীকার করেছি যে, তার পেছনে শক্তিশালী প্রমাণ আছে অথবা যুক্তি ও তথ্যের দিক দিয়ে কথাটি সত্য মনে হয়। অনুরূপভাবে আমি যে তাঁদেরকে মুজাদ্দিদ মেনে নিয়েছি, এটিও আমার নিজস্ব অভিমত। তাঁদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ রায় কায়েম করেছি। তাঁদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে একটি আকিদা হিসেবে আমি গ্রহণ করিনি।

প্রশ্ন

আমি পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আপনার দাওয়াত অধ্যয়ন করেছি। সলফি (চার ইমামের মযহাবের অনুসারী নয়) হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে আপনার ইসলামী আন্দোলনের একজন নগণ্য খাদেম ও সমর্থক মনে করি। এবং আমার সাধ্যমতো এ আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করার জন্যেও প্রচেষ্টা চালাই। সম্প্রতি তাসাউফ ও শায়খের ধ্যানে মগ্ন হওয়া সম্পর্কে কতিপয় বিষয় আমার মনে নানান প্রশ্নের অবতারণা করেছে। আপনি অনারব বেদআতকে 'মোবাহ' গণ্য করেছেন। অথচ আপনার এতদিনকার সমস্ত রচনাবলী এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের সমগ্র দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু, তখন খোদা না-খাস্তা যদি আমরা কোনো বেদআতকে স্বীকার করে নেই, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে সমস্ত বেদআতকে এ আন্দোলনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দেয়া। মেহেরবানী করে আমার একথাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাসাউফ ও শায়খের ধ্যানে মগ্ন হওয়া সম্পর্কে আপনার মতামত কি এবং এ ব্যাপারে আসল পন্থাই বা কি, তা জানাবেন। আশা করি, তর্জমানুল কুরআনে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনা করবেন।

জবাব

আমার কোনো একটি বাক্য থেকে আপনার মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোদিন সৃষ্টি হতো না, যদি আপনি এ প্রসংগে আমার অন্যান্য স্পষ্ট রচনাবলীও পাঠ করতেন। যাহোক তবুও আমি আপনার প্রশ্নগুলোর সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

১. তাসাউফ কোনো একটি জিনিসের নাম নয় বরং অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। আমরা যে তাসাউফের সত্যতা স্বীকার করি, সেটি এক জিনিস আর যার প্রতিবাদ করি সেটি অন্য জিনিস। আবার যে তাসাউফের আমরা সংশোধন চাই, সেটি এ দু'টি থেকে ভিন্নতর অন্য এক জিনিস ঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুফীগণের মধ্যে এক ধরনের তাসাউফের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন ফুযাইল বিন ইয়াজ (র), ইবরাহীম আদহাম (র), মারূফ কারখী (র)-এর কোনো পৃথক দর্শন ছিল না, কোনো পৃথক পদ্ধতি ছিল

না। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ছিল। আর কুরআনের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁদের ঐসব চিন্তা ও কর্মের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খোদাকে কেন্দ্র করে এবং একমাত্র খোদার জন্যে।

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ..........

আমরা এ তাসাউফের সত্যতা স্বীকার করি। শুধু সত্যতা স্বীকারই করি না বরং তাকে জীবন্ত ও পরিব্যাপ্ত করতে চাই।

দ্বিতীয় প্রকারের তাসাউফের মধ্যে গ্রীক দর্শন, বৈরাগ্যবাদ, জরথুষ্ট্রিয় মতবাদ ও বেদান্ত দর্শনের মিশ্রণ ঘটেছে। এতে খৃষ্টান ও হিন্দু যোগীদের পদ্ধতি শামিল হয়ে গেছে। শের্ক মিশ্রিত চিন্তা ও কর্ম এর সাথে সংমিশ্রিত হয়েছে। শরীয়ত, তরীকত ও মারেফত এখানে পৃথক পৃথক বিষয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে কমবেশী সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের বিপরীত ধর্মী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মানুষকে পৃথিবীতে খোদার খলীফার দায়িত্ব সম্পাদনকারী হিসেবে তৈরী করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের জন্যে তৈরী করা হয়। আমরা এ তাসাউফের বিরোধিতা করি। আমাদের নিকট এ বিলুপ্ত করা খোদার দীন কায়েম করার জন্যে আধুনিক জাহেলিয়াতের বিলুপ্তির ন্যায় সমপর্যায়ের জরুরী বিষয়।

এ দু'টি ছাড়া তৃতীয় এক ধরনের তাসাউফ আছে। এতে প্রথম ধরনের তাসাউফের কিছু অংশ এবং দ্বিতীয় ধরনের তাসাউফের কিছু অংশ সংমিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তাসাউফের পদ্ধতিসমূহ এমন কতিপয় মনীষী প্রণয়ন করেন, যাঁরা আলেম ও সদিচ্ছা সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু নিজের যুগের প্রধান বিষয়সমূহ ও পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব থেকে পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের আসল তাসাউফকে বুঝবার এবং তার পদ্ধতিসমূহকে জাহেলী তাসাউফের মিশ্রণ মুক্ত করার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাদের মতবাদে জাহেলী তাসাউফের কিছু না কিছু প্রভাব এবং তাদের কার্যাবলীতে বহিরাগত কার্যাবলীর কিছু না কিছু প্রভাব রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে তাঁদের মনে এ ধারণা জন্মে যে, এগুলো কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা বিরোধী নয় অথবা কমপক্ষে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এগুলোকে বিরোধহীন মনে করা যেতে পারে। উপরন্তু এ তাসাউফের উদ্দেশ্য এবং ফলাফলও ইসলামের উদ্দেশ্য ও তার প্রয়োজনীয় ফলাফল থেকে কমবেশী বিভিন্ন। মানুষকে সুস্পষ্টরূপে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে তৈরী করা তার উদ্দেশ্যই নয় কুরআন لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ বাক্য দ্বারা যে জিনিসের কথা বিবৃত করেছে তা তৈরি করাও তার উদ্দেশ্য নয়। তার মাধ্যমে এমন লোকও তৈরি হয়নি যে,

দীনের পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চিন্তা করতে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে পারে। এ তৃতীয় শ্রেণীর তাসাউফের আমরা পূর্ণ বিরোধিতা করি না আবার পূর্ণ সমর্থনও করি না। বরং তার সমর্থক ও অনুগতদের নিকট আমাদের আরজ হলো এই যে, মেহেরবানী করে মহান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাকে স্বস্থানে রেখে আপনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ তাসাউফের ওপর সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং একে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করুন। উপরন্তু যে ব্যক্তি এ তাসাউফের কোনো বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী দেখার কারণে তার সাথে মতবিরোধ করে, আপনি তার মতের সাথে বিরোধ করুন বা তাকে সমর্থন করুন—অবশ্যি তার এই সমালোচনার অধিকার অস্বীকার করতে পারেন না এবং খামাখা তার নিন্দাবাদ মুখর হতে পারেন না।

২. শায়খের আকৃতি ধ্যান করা সম্পর্কে আমার মত হলো এই যে, এ প্রসংগে দু'দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো একটি কার্য হিসেবে আর দ্বিতীয়টি হলো খোদার নিকটবর্তী হবার একটি মাধ্যম হিসেবে।

প্রথম অবস্থায় এ কার্যটির কেবল বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে। মানুষ কোন্ নিয়তে এ কার্য করে, তার ওপর এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। একটি নিয়ত এমন আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে একে হারাম বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয় নিয়তটি এমন যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ফকিহর পক্ষে একে অবৈধ বলা কঠিন হয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত এমন ঃ যেমন আমি কোনো ব্যক্তিকে একটি অপরিচিত মহিলার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করছো ? সে জবাব দিলো ঃ 'আমার সৌন্দর্য পিপাসা নিবৃত্ত করছি।' বলা বাহুল্য আমাকে বলতে হবে যে, তুমি অবশ্যি একটি খারাপ কাজ করছো। অন্য একজনকে এ কাজ করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো ঃ 'আমি একে বিয়ে করতে চাই।' এ অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে, তোমার এ কাজ অবৈধ নয়। কারণ সে তার এমন একটি কারণ বিবৃত করছে যাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলা যেতে পারে না।

শায়খের চিত্র ধ্যান করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমার মনে কোনোদিন সন্দেহ ছিল না, আজও নেই এবং অনেক মহান ব্যক্তির সাথে এর সম্পর্ক দেখালেও এভাবে সম্পাদিত কার্যটি পূর্ণতঃ অবৈধ। আমার মতে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার ও তা বৃদ্ধি করার মাধ্যম বিবৃত করার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কখনো কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি। তাহলে তাঁদের বিবৃত মাধ্যমের ওপরই আমরা নির্ভর করবো না কেন ? কেন আমরা এমন মাধ্যম উদ্ভাবন

করতে সচেষ্ট হবো, যা সংশয়ে পরিপূর্ণ এবং যার ব্যাপারে সামান্য অসতর্কতা মানুষকে নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর দিকে পরিচালিত করতে পারে ?

এ প্রসংগে এ আলোচনা নীতিগতভাবে অবান্তর যে, অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে যখন শরীয়তের গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে আমরা মোবাহ মাধ্যমসমূহ গ্রহণ করার অধিকার রাখি, তখন আত্মশুদ্ধি ও খোদার নৈকট্য লাভের ব্যাপারে আমাদের কেনইবা ঐ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করার অধিকার থাকবে না ? এ যুক্তি নীতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। কেননা দীনের দু'টি বিভাগ পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী। একটি বিভাগ হলো খোদার সাথে সম্পর্কের আর দ্বিতীয় বিভাগটি হলো মানুষ ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের। প্রথম বিভাগটির নীতি হলো এই যে, এতে খোদা ও তাঁর রসূলের বিবৃত ইবাদাত ও পদ্ধতির ওপর আমাদের নির্ভর করা উচিত। এতে কোন প্রকার কমতি বাড়তি করার অধিকার আমাদের নেই। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া আমাদের নিকট খোদার জ্ঞান ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করার তৃতীয় কোনো মাধ্যম নেই। এ ব্যাপারে যাবতীয় হ্রাসবৃদ্ধি বেদআতের শামিল এবং প্রত্যেকটি বেদআত গোমরাহির নামান্তর। যা কিছু নিষিদ্ধ নয়, তা মোবাহ, এ নীতি এখানে অচল। বরং এর বিপরীত পক্ষে এখানে নীতি হলো এই যে, যাকিছু কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নয়, তা বেদআত। এখানে কিয়াসের (সদৃশ ঘটনা হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) মাধ্যমেও যদি কোনো বিষয় স্থিরীকৃত হয়, তাহলেও অবশ্যি কুরআন ও সুন্নাতে তার কোনো ভিত্তি থাকতে হবে। বিপরীত পক্ষে মানুষের সাথে সম্পর্ক ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের বিভাগসমূহে মোবাহ বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট। যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য করুন। যে সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকুন। এবং যে বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি ; যদি তার সামঞ্জস্যশীল কোনো বিষয়ে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে তার ওপর কিয়াস করুন। অথবা যদি কিয়াসেরও সুযোগ না থাকে, তাহলে ইসলামের সাধারণ নীতি অনুযায়ী মোবাহসমূহের মধ্য হতে যে বিষয় ও পদ্ধতিকে ইসলামী ব্যবস্থার মেজাজ অনুযায়ী পান, তাকে গ্রহণ করুন। এ বিভাগে আমাদেরকে এ আজাদী দান করার কারণ হলো এই যে, আমরা যেন পৃথিবী, মানুষ ও পার্থিব বিষয়াবলী সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করার যুক্তি ও তত্ত্বগত উপকরণ কমপক্ষে এতটুকুন অবশ্যি অর্জন করি, যার ফলে খোদার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের নেতৃত্ব লাভ করার পর আমরা ভালোকে মন্দ থেকে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে পারি। কাজেই এ আজাদী কেবল ঐ বিভাগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তাকে প্রথম বিভাগটি পর্যন্ত বিস্তৃত করে, যা কিছু নিষিদ্ধ নয়, তাকে মোবাহ মনে করে খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের

ব্যাপারে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা অথবা অন্যের কাছ থেকে আহরণ করে তা গ্রহণ করা একটি মৌলিক ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে খৃষ্টানরা 'রাহবানিয়াত' আবিষ্কার করে, কুরআনে এর নিন্দা করা হয়েছে।– (তরজুমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল, '৭১ হিজরী, ফেব্রুয়ারী '৫২ খৃঃ)

প্রশ্ন

আপনার ওপর দোষারোপ করা হয় যে, আপনি আসলে নিজে মুজাদ্দিদ বা মেহ্‌দী হবার দাবীদার। অথবা পর্দান্তরালে থেকে নিজেকে মুজাদ্দিদ বা মেহ্‌দী বলে স্বীকার করাবার জন্যে চেষ্টা করছেন। এ দোষারোপের তাৎপর্য কি ?

জবাব

তরজুমানুল কুরআনে বহুবার এ দোষারোপের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাই এবার কোনো নতুন জবাব দেবার পরিবর্তে আমার আগের জবাবগুলোই উদ্ধৃত করছি।

সর্বপ্রথম ১৯৪১ সালে মাওলানা মুনাজির আহ্‌সান গীলানী করুণাবশতঃ নিম্নস্বরে আমার সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর জবাবে আমার 'সন্দেহ নিরসন' নামক প্রবন্ধে আমি আরজ করেছিলাম ঃ

> "আমার সাসহ্‌সুলভ শব্দাবলী থেকে সম্ভবতঃ আপনার মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আমি নিজেকে বিরাট কিছু মনে করি এবং কোনো বিরাট মর্যাদার আশা পোষণ করি। অথচ আমি যা কিছু করছি, কেবল নিজের গোনাহ্ মাফ করাবার জন্যে করছি। নিজের মূল্য আমি খুব ভাল করেই জানি। বিরাট মর্যাদা তো দূরের কথা, যদি কেবল শাস্তি থেকেও নিষ্কৃতি পাই, তাহলেও আশাতিরিক্ত মনে করি।"
>
> –(তরজুমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর-১৯৪১)

অতপর ঐ সময় মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদবী (র) আমার একটি বাক্য ওলট-পালট করে তা থেকে এ অর্থ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন যে, আমি মুজাদ্দিদ হবার দাবীদার। অথচ ঐ বাক্যের মধ্যে আমি নিজের নগণ্য প্রচেষ্টাবলীকে দীনের তাজদীদের প্রচেষ্টার মধ্যে একটি প্রচেষ্টা বলে গণ্য করেছিলাম। তাঁর এই সুস্পষ্ট দোষারোপের জবাবে আমি বলেছিলাম ঃ

> "কোনো কাজকে তাজদীদের কাজ বলার এ অর্থ হয় না যে, যে ব্যক্তি তাজদীদের কাজ করবে তাকে মুজাদ্দিদ পদবীও দান করতে হবে। আর শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হওয়া তো অনেক বড় কথা। ইট উঠিয়ে নিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করা অবশ্যি একটি গঠনমূলক কাজ। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যে

ব্যক্তি কয়েকটি ইট উঠিয়ে নিয়ে বসিয়ে দেবে, তাকে ইঞ্জিনিয়ার বলা হবে, আবার ইঞ্জিনিয়ারও সাধারণ নয়, শতাব্দীর ইঞ্জিনিয়ার ? অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি নিজের কাজকে যদি তাজদিদী কাজ বা তাজদিদী প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে—যখন বাস্তবে দীনের তাজদীদের উদ্দেশ্যেই সে এ কাজ করে—তখন সেটি হয় নিছক একটি বাস্তব ঘটনার প্রকাশ এবং তার অর্থ এ হয় না যে, সে মুজাদ্দিদ হবার দাবী করছে এবং তার শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হতে চায়। ক্ষুদ্রমনা লোকেরা অবশ্য সামান্য কাজ করে বড় বড় দাবী করতে থাকে বরং দাবীর আকারেই কাজ করার বাসনা করে। কিন্তু কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আশা করা যায় না যে, তিনি কাজ করার পরিবর্তে নিছক দাবী করবেন। দীনের তাজদীদের কাজ ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে অনেকে করছেন। মাওলানা সাহেবকেও (অভিযোগকারী) আমরা এরি মধ্যে গণ্য করি। আমিও নিজের সামর্থ মোতাবেক এ কার্যে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি এবং বর্তমানে আমরা কতিপয় দীনের খেদমতকারী একটি জামায়াতের আকারে এ কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তায়ালা যার কাজের মধ্যে এমন বরকত দান করবেন যে, তার ফলে তার হাতে যথার্থ খোদার দীনের তাজদীদের কার্য সম্পন্ন হবে, আসলে তিনিই হবেন মুজাদ্দিদ। দাবী করা বা দুনিয়ার কাউকে মুজাদ্দিদ উপাধি দান করা আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হলো এই যে, মানুষকে এমন কাজ করে তার যথার্থ মালিকের নিকট পৌঁছতে হবে যে, সেখানে যেন সে মুজাদ্দিদের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। মাওলানার জন্যে আমি এ জিনিসটিরই দোয়া করি। এবং তিনিও যদি অন্যের জন্যে এ দোয়া করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তার সাহায্যে দীনের এমনি সব কার্য সম্পাদন করেন, তাহলেই বেহতের হবে। আমি আশ্চর্য হই যে, অনেক ইসলামী শব্দকে খামাখা "বিভীষিকা" বানিয়ে রাখা হয়েছে। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি রোম জাতির গৌরব পুনরুদ্ধারের দাবী নিয়ে অবতীর্ণ হয় আর রোম জাতীয়তাবাদের পূজারীরা তাঁকে স্বাগত জানায়, কোনো ব্যক্তি বৈদিক সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের দাবী নিয়ে অগ্রসর হয়, আর হিন্দুরা তাকে সমর্থন জানায়। কোনো ব্যক্তি গ্রীক শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছায় এগিয়ে আসে আর শিল্পানুরাগীরা তার হিম্মত বাড়িয়ে দেয়। এ সকল সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মধ্যে একমাত্র খোদার দীনের সংস্কারটা কি এমন একটি অপরাধ যে, তার নাম উচ্চারণ করতে মানুষ লজ্জা অনুভব করবে এবং কেউ এ ধরনের চিন্তা প্রকাশ করলেই খোদার পূজারীরা তার পিছনে লেগে যাবে ?"–(তরজুমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৪১, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

এ সুস্পষ্ট বিবরণের পরও আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রচারণা বন্ধ করেননি। কেননা মুসলমানদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে যে সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল তন্মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার দাবী করার অভিযোগ উত্থাপন করাও একটি অস্ত্র ছিলো। কাজেই ১৯৪৫ ও '৪৬ সালে অনবরত এ সন্দেহ চতুর্দিকে ছড়ানো হয়েছে যে, এ ব্যক্তি 'মেহদী' দাবী করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি ১৯৪৬ সালের জুন সংখ্যা তরজুমানুল কুরআনে লিখেছিলাম ঃ

"যাঁরা এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করে মানুষকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, আমি তাদেরকে এমন একটি ভয়াবহ শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেছি যে, তা থেকে তারা কোনোক্রমেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। সে শাস্তি হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ্ আমি সব রকমের দাবী থেকে নিজেকে নিষ্কলুষ রেখে আমার খোদার সমীপে হাজির হয়ে যাবো এবং তারপর দেখবো যে, এরা খোদার সম্মুখে নিজেদের এসব সন্দেহ এবং এগুলো বিবৃত করে মানুষকে হকের পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখার স্বপক্ষে কি সাফাই পেশ করেন।"

এসব লোকের দিলে যদি কিছু পরিমাণ খোদাভীতি ও পরকাল বিশ্বাস থাকতো, তাহলে আমার এ জবাবের পর তাদের মুখে পুনর্বার এ অভিযোগ শুনা যেতো না। কিন্তু কেমন নির্ভীকভাবে আজ আবার সেই অভিযোগগুলোকে ছড়ানো হচ্ছে, তা সবাই প্রত্যক্ষ করছেন। তরজুমানুল কুরআনের সাম্প্রতিক সংখ্যাসমূহে এ সম্পর্কে যাকিছু লিখেছি, তা অধ্যয়ন করার পরও এদের কারোর মুখে অপপ্রচার একটুও বাধছে না। আখেরাতের ফায়সালা অবশ্যি খোদার হাতে, কিন্তু আমাকে জানান, এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে দুনিয়ায় আলেম সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকার আশা আছে কি ?

মজার কথা হলো এই যে, 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' কিতাবের বিভিন্ন বাক্যের ওপর এসব সন্দেহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং তার উদ্ধৃতাংশ বিভিন্ন রঙে রঙিন করে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ তারই পৃষ্ঠায় আমার এ একথাগুলো আছে ঃ

"দাবীর মাধ্যমে কার্যারম্ভ করার অধিকার নবী ছাড়া আর কারোর নেই এবং নবী ছাড়া আর কেউ নিশ্চিতভাবে একথা জানেন না যে, তিনি কোন্ কার্যে আদিষ্ট হয়েছেন, মেহদী কোনো দাবী করার জিনিস নয়। এ ধরনের দাবী যাঁরা করেন আর যারা এর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেন আমার মতে

তাঁরা উভয়েই নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও মানসিক অধোগতির প্রমাণ পেশ করেন।"

আজ যেসব লোক আমার বই থেকে উদ্ধৃতাংশ পেশ করেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমার ঐ বইয়ে উল্লিখিত কথাগুলো কি তাদের নজরে পড়েনি ? অথবা তারা সজ্ঞানে এগুলো প্রচ্ছন্ন রেখেছেন ?-(তরজুমানুল কুরআন, যিলকদ, যিলহজ্জ, '৭০ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৫১ খৃঃ)

প্রশ্ন

"ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব সম্পর্কে আপনি 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' কিতাবে যা লিখেছেন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ আছে। আপনি মেহ্দীর জন্যে কোনো বিশেষ আলামত স্বীকার করতে রাজী নন। অথচ হাদীসে মেহ্দীর আলামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এ ক্ষেত্রে এসব হাদীসকে কেমন করে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ?"

জবাব

ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব সম্পর্কে হাদীসে যেসব বর্ণনা আছে সে সম্পর্কে হাদীস বিশ্লেষণকারীগণ এত কঠোর সমালোচনা করেছেন যে, তাঁদের মধ্যে একটি দল আদতে ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাবকে স্বীকারই করেন না। এ হাদীসগুলো যারা বর্ণনা করেছেন তাদের সমালোচনা করার পর জানা যায় যে, তাদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইতিহাস পর্যালোচনা করেও জানা যায় যে, প্রত্যেকটি দল নিজেদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্যে এ হাদীসগুলো ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের কোনো ব্যক্তির গায়ে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এসব কারণে আমি এ মীমাংসায় পৌছেছি যে, ইমাম মেহ্দীর নিছক আবির্ভাবের ব্যাপারে এ হাদীসগুলোর বর্ণনা সত্য কিন্তু বিস্তারিত আলামত সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর অধিকাংশই সম্ভবত মনগড়া এবং স্বার্থবাদীরা সম্ভবত পরবর্তীকালে এগুলো নবী করীমের আসল বাণীর ওপর বৃদ্ধি করেছে। বিভিন্ন যুগে যেসব লোক মেহ্দী হবার মিথ্যা দাবী করেছে তাদের বইপত্রেও দেখা যায় যে, তাদের সকল ফেতনা সৃষ্টির মূলে এ বর্ণনাগুলোই তথ্য সরবরাহ করেছে।

নবী করীম (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমি দেখেছি যে, তাদের ধরন কখনো মেহ্দীর আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীসের ন্যায় নয়। নবী করীম (স) কখনও কোনো আগমনকারী বস্তুর আলামত ও বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেননি। তিনি অবশ্যি বড় বড় মূল আলামত বর্ণনা করতেন, কিন্তু খুঁটিনাটি বিবরণ দান তাঁর পদ্ধতি ছিল না।

প্রশ্ন

"মেহদীর আগমনের প্রয়োজনকে 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে কিন্তু মেহদীর কাজ কি হবে, এ সম্পর্কে হাদীসের উল্লেখ ছাড়াই নিছক নিজের কথায় বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে এগুলো বর্ণনা করাই সংগত হবে। উপরন্তু মেহদীর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি এবং তাঁকে সাধারণ মুজাদ্দিদগণের ন্যায় গণ্য করা হয়েছে। যদিও কামিল মুজাদ্দিদ ও অপরিণত মুজাদ্দিদের শ্রেণী বিভাগ করার কারণে মনে হতে পারে যে, সম্ভবত এখানে আভিধানিক অর্থে মুজাদ্দিদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়, তবুও মুজাদ্দিদ যখন পাপমুক্ত হন না, এবং মেহদীর পাপমুক্ত হবার প্রয়োজন, তখন এ সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকার পর মেহদী কেমন করে মুজাদ্দিদের ফিরিস্তিতে শুমার করা যেতে পারে।"

জবাব

প্রথমতঃ হাদীসে ব্যবহৃত "মেহদী" শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। নবী করীম (স) মেহদী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো সঠিক পথ প্রাপ্ত 'হাদী' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, সঠিক পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মেহদী হতে পারেন। বড়জোর বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করার জন্যে 'আল মেহদী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাহায্যে আগমনকারীর কোনো বিশেষ গুণ প্রকাশ করাই আসল উদ্দেশ্য আর এ বিশেষ গুণ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আগমনকারী নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফতের ব্যবস্থা (খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত) ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার এবং পৃথিবী যুলুম নির্যাতনে ভরে যাবার পর পুনর্বার নতুন করে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত কায়েম করবেন এবং ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করবেন। এজন্যে তাঁকে বৈশিষ্ট্যশালী করার উদ্দেশ্যে "মেহদী" শব্দের পূর্বে 'আল' সংযোগ করা হয়েছে। কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে, মেহদী নামে ইসলামে কোনো মর্যাদাপূর্ণ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার ওপর ঈমান আনা ও সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা নবীদের ওপর ঈমান আনা ও তাদের আনুগত্য করার ন্যায় নাজাত লাভের এবং ইসলাম ও ঈমানের জন্যে শর্ত স্বরূপ। উপরন্তু মেহদী হবেন কোন নিষ্পাপ ইমাম, হাদীসে এ ধারণারও কোনো অস্তিত্ব নেই। আসলে গায়ের নবীদের সম্পর্কে নিষ্পাপ হবার এই ধারণা নির্জলা শিয়া চিন্তাপ্রসুত। কুরআন ও সুন্নাহে এর কোনো উল্লেখ নেই।

একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, যেসব জিনিসের ওপর ঈমান ও কুফরী নির্ভরশীল এবং যেসব বিষয়ের ওপর মানুষের নাজাত নির্ভরশীল,

সেগুলো বিবৃত করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজের ওপর নিয়েছেন। সেসব কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এবং কুরআনেও সেগুলো নেহাত ইশারা ইংগিতে বিবৃত করা হয়নি বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন ঃ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى –"মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার নিজের।" কাজেই যে বিষয়টি ইসলামে এই পর্যায়ে পৌছে যায় তার প্রমাণ অবশ্যি কুরআন থেকে দিতে হবে। ঈমান ও কুফরী যে জিনিসটির ওপর নির্ভরশীল, নিছক হাদীসের উপর তার ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে না। হাদীস কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তির নিকট পৌছে। এ থেকে বড়জোর নির্ভুল ধারণা লাভ করা যেতে পারে, নিশ্চিত জ্ঞান নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে কখনো বিপদে ফেলতে চান না। যেসব বিষয় তাঁর নিকট এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যে তার মাধ্যমে ঈমান ও কুফরীর পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাকে তিনি মাত্র কতিপয় ব্যক্তির বর্ণনার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে অবশ্যি আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করবেন, আল্লাহ্‌র রসূল সেগুলোকে নিজের পয়গম্বরীর আসল কাজ মনে করে ব্যাপক ও সাধারণভাবে তা প্রচার করবেন এবং পূর্ণ সংশয়হীন পদ্ধতিতে সেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের নিকট পৌছিয়ে দেয়া হবে।

মেহদী সম্পর্কে যতই টেনে-হিঁচড়ে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখতে পারেন যে, ইসলামে তার অবস্থা এমন নয় যে, তাঁকে জানার ও স্বীকার করার ওপর কোনো ব্যক্তির মুসলমান হওয়া ও নাজাত লাভ নির্ভর করে। তিনি যদি এ পর্যায়ে অবস্থান করতেন, তাহলে কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বর্ণনা করা হতো এবং নবী করীম (স)ও মাত্র দু-চারজন লোকের নিকট তা বর্ণনা করা যথেষ্ট মনে করতেন না বরং সমস্ত উম্মতের নিকট তা পৌছিয়ে দেবার জন্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতেন। তৌহিদ ও আখেরাতের কথা প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে যে রূপে দেখি, এ বিষয়টি প্রচারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপে আমরা তাঁকে দেখতাম। আসলে যে ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্য গভীর দৃষ্টিও রাখেন, তিনি এক মুহূর্তের জন্যে একথা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, ইসলামে যে বিষয়টির এতবেশী গুরুত্ব, সেটিকে নিছক খবরে ওয়াহেদ (যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনো এক পর্যায়ে একজন, দু'জন বা তিনজনে এসে ঠেকে) এর ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। আর খবরে ওয়াহেদও এমন পর্যায়ের যে, ইমাম মালিক (র), ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিমের (র) ন্যায় মুহাদ্দিসগণ সেগুলোকে নিজেদের সংকলনে স্থান দেয়া পছন্দই করেননি।–(তরজুমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল, জমাদিউল আখের, ১৩৬৪ হিজরী, মার্চ-জুন, ১৯৪৫ খৃঃ)

প্রশ্ন

কতিপয় দীনদার ও আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে আপনার ইমাম মেহ্দী সম্পর্কিত বর্ণনাবলীর বিরুদ্ধে হাদীসের আলোকে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাদের আপত্তিসমূহ আপনার সম্মুখে পেশ করছি। একথা বলার পেছনে আমার এ অনুভূতি সক্রিয় রয়েছে যে, দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের সমগ্র কাজে শরীয়তের আনুগত্য অপরিহার্য। কাজেই আপনার লেখনী প্রসূত প্রত্যেকটি জিনিস শরীয়ত মোতাবিক হতে হবে। আর যদি কখনো আপনার লেখনী ত্রুটিপূর্ণ মত ব্যক্ত করে, তাহলে তা শুধরে নেবার ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার ইতস্ততঃ ভাব না থাকে।

১. ইমাম মেহ্দী সম্পর্কে আপনি ৩১ হতে ৩৩ পৃষ্ঠা[১] পর্যন্ত যা লিখেছেন, তা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী হাদীস বিরোধী। এ প্রসঙ্গে আমি তিরমিযি ও আবু দাউদের সমস্ত হাদীস অধ্যয়ন করেছি। তা থেকে জানা যায় যে, কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী অবশ্যি খারেজী অথবা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ; কিন্তু আবু দাউদ ও তিরমিযিতে এমন হাদীস অবশ্যি আছে যার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। তারা আপনার মতের সত্যতা প্রমাণ করে না বরং তার প্রতিবাদ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবু দাউদের হাদীসটি দেখুন ঃ

حدثنا محمد بن المثنى .... عن ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هارنا الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخر جونه وهو كاره فينا يعونه بين الركن والمقام-(كتاب المدى)

এ হাদীসটি থেকে নিয়ে শেষ হাদীসটি পর্যন্ত পড়ুন। দেখবেন সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত। উপরন্তু বায়হাকির একটি বর্ণনা মিশকাতের কিতাবুল ফিতানে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ثوبان قال رايتم الرايات السود قد جاء ت من قبل خرا سان فاتوها

فان فيها خلية الله المهدى-

১. বর্তমান সংস্করণের ২৬ হতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

মেহদী তার মেহদী হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে উপরোক্ত হাদীসগুলো আপনার একথার প্রতিবাদ করছে। বিশেষ করে একথাগুলো দেখুন ঃ

وجب على كل مومن نصره او قال اجابيه

তাছাড়া তিরমিযির একটি বর্ণনার একথাগুলো অনুধাবন করুন ঃ

قال فيجئى اليه الرجل فيقود يا مهدى ! اعطنى ! اعطنى ! قاد فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان يحمله۔

২. আপনি বলেছেন যে, মেহদী আধুনিক ধরনের নেতা হবেন --- ইত্যাদি। আপনার এ দাবীর স্বপক্ষে কোনো হাদীস নেই। থাকলে লিখে জানাবেন। যারা আপনার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করে, তাদের স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণ হলো এই যে, এতদিন পর্যন্ত যতগুলো মুজাদ্দিদ এসেছেন তাঁদের সবাই প্রধানতঃ সুফী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩. আপনার এ কথায় যে তিনি আধুনিক ধরনের নেতা হবেন, সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে যে, আপনি নিজেই ইমাম মেহদী হবার দাবী করবেন।

৪. 'আলামতে কিয়ামত' পুস্তকে (লেখক ঃ মাওলানা শাহ রফীউদ্দিন, অনুবাদক ঃ মৌলবী নূর মুহাম্মদ) ইমাম মেহদী সম্পর্কে মুসলিম ও বুখারীর বরাত দিয়ে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করার পর মুসলিম ও বুখারীতে আমি এমন কোনো হাদীস পাইনি। এ পুস্তকে উদ্ধৃত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, মেহদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে ঃ

هذا خليفة اللّه المهدى فاستمعوا له واطيعوا

এ হাদীসটি সম্পর্কে আপনার কি মত ?

জবাব

১. ইমাম মেহদী সম্পর্কে যেসব হাদীস বিভিন্ন হাদীস পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আমার অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্তসার পেশ করেছি। যারা ইমাম মেহদী সম্পর্কে কোনো কথা স্বীকার করার জন্যে কেবল সে কথাটি হাদীসের কোনো কিতাবে উল্লেখিত থাকাই যথেষ্ট মনে করেন, অথবা অনুসন্ধানের হক আদায় করার জন্যে কেবল বর্ণনাকারীরাই সত্যবাদী কিনা একথা জানাই যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তাদের জন্যে সেই ধরনের বিশ্বাস রাখা বৈধ যা তাঁরা হাদীসে পেয়েছেন। কিন্তু যারা এ সমস্ত হাদীস

একত্রিত করে এদের তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের সন্ধান পান, উপরন্তু যাদের সম্মুখে বনি ফাতেমা, বনি আব্বাস ও বনি উমাইয়ার সংঘর্ষের পূর্ণ ইতিহাস আছে এবং তাঁরা পরিষ্কার দেখেন যে, এ সংঘর্ষে বিভিন্ন দলের স্বপক্ষে অসংখ্য হাদীস রয়েছে এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যেও অধিকাংশ তারাই যাদের কোনো এক পক্ষের সাথে প্রকাশ্য সম্পর্ক ছিল, তাদের জন্যে এ হাদীসগুলোর সমগ্র বিস্তারিত অংশকে নির্ভুল মেনে নেয়া কঠিন। আপনি নিজেও যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেও الرايات السود অর্থাৎ "কালো ঝাণ্ডা"র উল্লেখ আছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কালো ঝাণ্ডা ছিল বনি আব্বাসের ঐতিহ্য। উপরন্তু ইতিহাস থেকে এও জানা যায় যে, এ ধরনের হাদীস পেশ করে বাদশাহ মেহদী আব্বাসীকে প্রতিশ্রুত মেহদী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। এখন যদি কেউ এ বিষয়টি মেনে নেয়ার ওপর জোর দেন, তাহলে তিনি একে মেনে নিতে পারেন এবং 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে আমি যে মত প্রকাশ করেছি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক, তত্বগত ও ফিকাহ সম্পর্কিত বিষয়ে আমার কথাই সবার জন্যে স্বীকার্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। এসব বিষয়ে আমার কোনো অনুসন্ধান কারোর জন্যে পছন্দনীয় না হলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারেও আমার সাথে সহযোগিতা করা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে, একথাও ঠিক নয়। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে শাস্ত্রকারদের মধ্যে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হওয়া আজকের কোনো নতুন কথা নয়।

২. প্রতিশ্রুত মেহদী আধুনিক ধরনের লীডার হবেন, আমার একথার অর্থ এ নয় যে, তিনি দাঁড়ি চেঁছে ফেলবেন, স্যুট-কোট পরবেন এবং আপটুডেট ফ্যাসানে চলাফেরা করবেন। বরং এর অর্থ হলো এই যে, তিনি যে জামানায় পয়দা হবেন, সে জামানার জ্ঞান-বিজ্ঞান, অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকবেন। সমকালীন যুগোপযোগী বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন। এবং সমকালীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করবেন। এটি একটি অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কথা। এর জন্যে কোনো হাদীসের প্রয়োজন নেই। নবী করীম (স) যদি তাঁর যুগের পরিখা, কাঠের কামান (Battering Ram), প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আগামী কোনো যুগে যে ব্যক্তি নবী করীমের স্থলাভিষিক্তের হক আদায় করতে অগ্রসর হবেন তিনি অবশ্যি ট্যাংক, এরোপ্লেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমকালীন অবস্থা ও বিষয়াবলী থেকে অসম্পর্কিত হয়ে কাজ করতে পারবেন না। শক্তির আধুনিকতম উপায়-উপকরণ লাভ করা এবং নিজের প্রভাব বিস্তৃত

করার জন্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করাই হলো কোনো দলের উদ্দেশ্য সাধন ও কোনো আন্দোলনের বিজয় লাভের স্বাভাবিক পথ।

৩. এই যে কথাটি বললেন যে, "এ থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তুমি নিজেই ইমাম মেহদী হবার দাবী করবে" এর জবাবে আমি এছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করা এমন কোনো ব্যক্তির কাজ হতে পারে না, যে খোদাকে ভয় করে, খোদার সম্মুখে নিজের দায়িত্বের অনুভূতি রাখে এবং খোদার এ নির্দেশও স্মরণ রাখে যে ঃ اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ অর্থাৎ "অধিকাংশ সন্দেহ থেকে দূরে থাকো, অবশ্যি অনেক সন্দেহ গোনাহর কারণ।" যারা এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে মানুষকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, আমি তাদেরকে এমন একটি ভীষণ শাস্তি দিতে মনস্থ করেছি, যা থেকে তারা কোনোক্রমে রেহাই পেতে পারে না। আর সে শাস্তি হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ আমি সব রকমের দাবী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে খোদার সম্মুখে পৌঁছে যাবো। অতপর এই লোকেরা খোদার সম্মুখে এদের সন্দেহসমূহ এবং সেগুলো বিবৃত করে মানুষকে হকের পথে বাধা দেবার স্বপক্ষে কি সাফাই পেশ করেন, তা আমি দেখবো।

৪. 'আলামতে কিয়ামত' কিতাবে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিছুই বলতে পারি না। যদি তা নির্ভুল এবং সত্যি নবী করীম (স) যদি এমন খবর দিয়ে থাকেন যে, মেহদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণের সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে যে, هذا خليفة الله لمهدى فاستمعوا له واطيعوا অর্থাৎ 'ইনিই আল্লাহর খলিফা মেহদী, এঁর কথা শুনো ও এঁর আনুগত্য করো'—তাহলে 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে আমি এ সম্পর্কে যে রায় পেশ করেছি তা ভুল। কিন্তু আমি আশা করি না যে, নবী করীম (স) এমন কথা বলবেন। কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, কোনো নবীর আগমনেও আকাশ থেকে এ ধরনের আওয়াজ আসেনি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার দ্বিতীয় কোনো সুযোগ আসবে না, তবুও তাঁর আগমনে আকাশ থেকে এমন কোনো আওয়াজ শুনা যায়নি। মক্কার মুশরিকরা দাবী করতে থাকে যে, আপনার সাথে কোনো ফেরেশতা থাকতে হবে, তিনিই আমাদেরকে জানাবেন যে, ইনি খোদার নবী। অথবা এমন কোনো সুস্পষ্ট নিশানী থাকতে হবে, যা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে আপনার নবী হবার বিষয় জানা যাবে। কিন্তু আল্লাহ

তায়ালা তাদের এ সকল দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং এগুলো গ্রহণ না করার কারণসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন যে, সত্যকে পূর্ণরূপে আবরণ মুক্ত করা, যার ফলে বুদ্ধিগত পরীক্ষার অবকাশ না থাকে, এমন পদ্ধতি খোদার হিকমাতের পরিপন্থী। এখন একথা কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নিয়ম একমাত্র ইমাম মেহদীর ব্যাপারে পরিবর্তন করবেন এবং তাঁর বাইয়াতের সময় আকাশ থেকে আওয়াজ দেবেন যে, "ইনিই খোদার খলিফা মেহদী এঁর কথা শুনো, এঁর আনুগত্য কর।"

–(তরজুমানুল কুরআন, রজব, ১৩৬৫ হিজরী, জুন, ১৯৪৬ খৃঃ)